KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৬৪ আশ্বিন, ১৩৬৪ কার্তিক, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible], আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

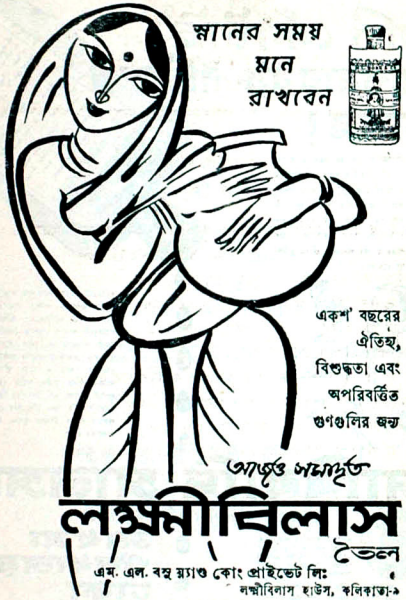

সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ ঃ কার্ত্তিক ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ ঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৩৭
সংস্কৃত গবেষণার দু'একটী দিক্ ঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ৪৪৪
কালিদাসের কাব্যে ফুল ঃ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৪৭
অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য ঃ চিন্তামণি কর ৪৫৫
ক বি তা ॥ বসন্তের স্বাদ ঃ অসীম সোম ৪৬১
অনুবেদন ঃ উৎপল চৌধুরী ৪৬২
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা ঃ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৩
আ লো চ না ॥ প্রবাস-পুরাণ ঃ অমল ঘোষ ৪৭১
একান্নবর্তী পরিবার ঃ সরিৎশেখর মজুমদার ৪৭৫
স মা জ স ম স্যা ॥ গুরুজন-সমস্যা ঃ অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৪৭৮
স মা লো চ না ॥ হিমাদ্রি ঃ মণি গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮১
নিঃসঙ্গ মেঘ ঃ মালবিকা সরকার ৪৮২

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়াময় এই সংসারে সর্বত্রই মায়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ার প্রসাদেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, মরীচিকায় স্রোতস্বতীভ্রম হয়। শব্দরাশিও এই মায়াপাশ অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণে অনেক স্থলে পরস্পর অসম্বন্ধ শব্দগুলিও সুসম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষা হইতে এইরূপ কয়েকটী শব্দের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বৃথা ও ব্যর্থ

বৃথা ও ব্যর্থ এই দুইটী শব্দের শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট, অথচ ইহারা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র শব্দ। বিগত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার এইভাবে বি এই উপসর্গের সহিত অর্থশব্দের বহুব্রীহি করিলে 'ব্যর্থ' হয়, আর বৃ ধাতুর উত্তর থা প্রত্যয় করিয়া 'বৃথা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা, বাঞ্ছিয়া লওয়া, ইচ্ছা করা। থা প্রত্যয়ের অর্থ প্রকার। থা প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদগুলি ক্রিয়ার বিশেষণ (adverbs of manner)। সুতরাং বৃথা-শব্দের অর্থ —স্বেচ্ছায়, অনায়াসে, সহজে বেদের বিধি অনুসারে নহে, কিন্তু অবাধে, নিজের ইচ্ছানুসারে (at one's own sweet will) আর যাহা শাস্ত্রের বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সার্থক, যাহা স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মের দিক্ দিয়া তাহা নিরর্থক, ফলে ক্রমশঃ বৃথাশব্দের অর্থ হইল—নিরর্থক, অবিধিপূর্বক। তাই আমরা অমরকোষে পাই—বৃথা নিরর্থকাবিধ্যোঃ। বিশ্ব-প্রকাশকার আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—বৃথা নিষ্কারণে বন্ধ্যে বৃথা স্যাদ্বিধিবর্জিতে। ঋগ্বেদে (১।৯২।২) ঊষার বর্ণনায় আছে—

উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা
স্বায়ুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা
রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ॥

অরুণবর্ণ রশ্মিগুলি সানন্দে (বৃথা) উৎপতিত হইয়াছে, অতি সহজে যে গোরুগুলিকে রথে যোজিত করা যায় সেই অরুণবর্ণ গোরুগুলিকে রথে যোজিত করিয়াছেন, ঊষারা পূর্বের মত

আলোকের জাল রচনা করিয়াছেন, অরুণবর্ণ উষারা উজ্জ্বল আলোক সুদূরে বিস্তারিত করিয়াছেন।

বৃথা পশুহনন শব্দের অর্থ—নিজের সুখের জন্য পশুহনন, যজ্ঞাদির জন্য নহে। বৃথা মাংসভক্ষণ শব্দের অর্থ—নিজের ইচ্ছায় মাংসভক্ষণ, শাস্ত্রের নির্দেশে নহে। মনুসংহিতায় বৃথাট্যা বা বৃথাভ্রমণ ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৩।৬) আছে—ঋগ্ গাথা কুম্ব্যা তন্মিতং যজুর্নিগদো বৃথা বাক্ তদমিতম্ অর্থাৎ ঋক্ গাথা ও কুম্ব্যা (আচারশিক্ষাদাত্রী কুম্ব্যা, যেমন ব্রহ্মচার্যসি, অপোহশান, কর্ম কুরু, মা সুষুপ্থাঃ ইত্যাদি) এইগুলি মিত। আর যজুর্মন্ত্র, নিগদ ও স্বেচ্ছায় উচ্চারিত শব্দ অমিত। এ স্থলে বৃথা শব্দের মধ্যে যেন একটু নিরর্থকতার আভাস আছে বলিয়া মনে হয়।

কালিদাসের সময় যে বৃথাশব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুমারসম্ভবে আছে—

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা
ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ॥ ৫।৪৫

"স্বর্গই যদি কামনা তোমার কাজ কি এ তপে তবে
অমরাবতী ত তোমারি পিতার রাজ্যে জানে তা সবে।
তবে কি কামনা প্রিয়পতিলাভ বৃথা এ সাধনা হায়
রত্ন আপনি খোঁজে না জহুরী, জহুরীই খোঁজে তায়॥"

উত্তররামচরিতে এই অর্থে বৃথা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্যং হরীণাং বৃথা (৩।৪৫)। যেখানে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ব্যর্থ, যেখানে বানরগণের বীরত্ব ব্যর্থ।

চাণক্য শ্লোকে আছে—

বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তস্য ভোজনম্।
বৃথা দানং সমর্থস্য বৃথা দীপো দিবাপি চ॥

একটী উদ্ভট শ্লোকে আছে—

বৃথা কথং নৃত্যসি চাতক ত্বং
ন নীলমেঘোঽথ গজো মদান্ধঃ।
স তাদৃশেভ্যো ন দদাতি নূনং
মতঙ্গদানং মধুপেভ্য এব॥

হে চাতক, তুমি কেন (আনন্দে বিহ্বল হইয়া) মিছামিছি নৃত্য করিতেছ? এ ত নীলমেঘ নহে, এ মদমত্ত হস্তী। সে কখন তোমার মত প্রার্থীদের কিছু দান করে না। মধুপগণের (ভ্রমরগণের) জন্যই মাতঙ্গের দান (মদবারি)।

বৃথাশব্দের এই অর্থের পরিবর্তনে সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত। প্রথমে লোকের ধারণা ছিল, যাহাতে আত্মার আনন্দ, যাহাতে আত্মতুষ্টি তাহাই সৎ। পরে সভ্যসমাজে স্বেচ্ছাচারের অপ্রতিহত প্রসার দেখিয়া লোকের মনে হইল—যাহা নিজের ইচ্ছায় করা যায়, যাহার পশ্চাতে শাস্ত্রের নির্দেশ না থাকে, তাহাই নিরর্থক, তাহাই অসৎ।

শ্রদ্ধা ও অদ্ধা

আপাতদৃষ্টিতে অদ্ধা শব্দটী শ্রদ্ধাশব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।, যেমন 'পবন' ও 'বনে'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন 'মানব' ও 'নব'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রদ্-শব্দের উত্তর ধা ধাতুর পরে অঙ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রদ্ধাশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্-শব্দের অর্থ হৃদয়, গ্রীক্ Kardia, লাটিন Cor, Cordis, লিথুয়েনীয় শির্দিস্, জার্মান্ Herz, ইংরাজী heart ইহারা এই শ্রদ্-শব্দের জ্ঞাতি। ধা ধাতুর অর্থ স্থাপন করা, দান করা, সুতরাং শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ হৃদয়দান, বিশ্বাসস্থাপন, বিশ্বাস।

অদ্ শব্দের উত্তর প্রকার অর্থে ধা প্রত্যয় করিয়া অদ্ধা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইভাবে, অর্থাৎ সত্য সত্য ঠিক ভাবে, যথার্থভাবে। এই শব্দটী আবেস্তায় azda আকারে দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ নিশ্চয়, জ্ঞান।

যাহা সত্য হয় লোকে তাহা বিশ্বাস করে, আবার যাহা বিশ্বাস করে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে, ফলে শ্রদ্ধা ও অদ্ধা এই দুইটী শব্দের মধ্যে অর্থগত একটু সাদৃশ্য আছে, আর শব্দগত সাদৃশ্য ত সুপরিস্ফুট। কোন কোন স্থলে দেখা যায় শব্দের আদিস্থিত স লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন ইংরাজীতে আমরা পাই star কিন্তু সংস্কৃত স্তৃ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তারাকেও দেখিতে পাই। প্রাচীন স্তরশব্দ অশ্বতর, বৎসতর প্রভৃতি শব্দে তর-আকারে দৃষ্ট হয়। অনেকের মনে হয় এইভাবেই শ্রদ্ধার আদিস্থিত শ্ ও র্ লুপ্ত হইয়া অদ্ধা হইয়াছে। এই সব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন অদ্ধা শব্দটী শ্রদ্ধারই অপভ্রংশ। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া মনীষিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর—

"সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।"

'অর্থাৎ সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যহীন আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে ইঁহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি, যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।

'এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে।'

শঙ্করাচার্যপ্রভৃতির মতে শেষ অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে ঃ এই লোক হইতে গমন করিয়া ইঁহাকেই অনুভব করিব, যাঁহার সত্যই এইরূপ জ্ঞান হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে পাইয়া থাকেন।

অদ্ধাশব্দের অর্থ যে সত্য সত্য, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে (১০ ১২।৬) আছে

যো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসর্জনেনা-
থা কো বেদ যত আবভূব॥

কে ঠিক ভাবে জানে, কে এখানে বলিবে, কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, কোথা হইতে এই নানাবিধ সৃষ্টি আসিল? দেবগণ এই বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ববর্ত্তীকালের পরবর্ত্তী (কেননা তাঁহারাও সৃষ্টির অংশ।) তাহা হইলে কে জানে কোথা হইতে ইহা আসিল। কালিদাসের রঘুবংশে (১৩।৬৫) আছে—

অন্ধা প্রিয়ং পালিতসংগরায়
প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্‌
সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে ।।

যুদ্ধে খরপ্রভৃতি রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে লক্ষণ যেমন (রাক্ষসাক্রমণ হইতে) সুরক্ষিত তোমাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সাধুও প্রতিজ্ঞা-পালনপূর্বক প্রত্যাগত আমাকে, অনুপভুক্তা রাজলক্ষ্মীকে সত্যসত্যই প্রত্যার্পণ করিবেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ভামিনীবিলাসে আছে—

হালাহলং খলু পিপাসতি কৌতুকেন
কালানলং পরিচুচুম্বিষতি প্রকামম্‌।
ব্যালাধিপং চ যততে পরিরব্ধুমন্ধা
যো দুর্জনং বশয়িতুং তনুতে মনীষাম্‌ ।

যিনি দুর্জনকে বশ করিতে মানস করেন তিনি সানন্দে কালকূট বিষ পান করিতে ইচ্ছা করেন, প্রাণ ভরিয়া প্রলয়কালীন অগ্নিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, সত্য সত্যই সর্পরাজকে আলিঙ্গন করিতে প্রযত্ন করেন। রসগঙ্গাধরে আছে—

প্রণিপত্য বিধে ভবন্তমন্ধা
বিনিবদ্ধাঞ্জলিরেকমেব যাচে।
জনুরস্তুকুলেকৃষীবলানা-
মপি গোবিন্দপদারবিন্দভাজাম্‌॥

সুতরাং দেখা গেল শ্রন্ধা ও অন্ধার সম্বন্ধ প্রাতিভাসিক পারমার্থিক নহে।

বাব ও বাবা

তৈত্তিরীয়সংহিতা-প্রভৃতি গ্রন্থে অবধারণার্থক বা বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত বাব এই নিপাত মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত 'বা' এই নিপাতের দ্বিত্ব করিয়া বাব হইয়াছে মনে হয়। ইহার সহিত বাংলার বাবাশব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের গীতা ব্যাখ্যা ভূমিকায় ১৮৭ পৃষ্ঠে দেখা যায়— কোথাও বাব অর্থাৎ বাবা বা বৎস বলিয়া শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন, যেমন অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে আছে—মঘবন্‌ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোহধিষ্ঠানম্‌। আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্‌। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ

হে ইন্দ্র, এই শরীরটী মরণধর্মী, সর্বদা মৃত্যুদ্বারা গৃহীত। সেই অমরণধর্মী ও অশরীরী আত্মার ইহাই অধিষ্ঠান। শরীরবিশিষ্ট আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয়কর্তৃক আক্রান্ত

(সুখ ও দুঃখের অধিকারভুক্ত) কেন না যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ প্রিয় বা অপ্রিয়ের বিনাশ হয় না (সুখ দুঃখের পাশ হইতে মুক্তি নাই)। শরীরশূন্য হইলেই প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্যের মধ্যস্থিত অপাদাদিস্থিত সম্বোধন পদ অনু-দাত্ত হয়। বাবশব্দের অনুদাত্ত হওয়া ত দূরের কথা একটী স্বরের স্থলে ইহার দুইটী স্বরই উদাত্ত। সুতরাং ইহার অর্থ কিছুতেই বাবা বা বৎস হইতে পারে না।

পর ও অপর

সংস্কৃত ব্যাকরণে সর্বনামসংজ্ঞক শব্দের তালিকায় পর ও অপর এই দুইটী শব্দই পঠিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পর্যাপ্ত অপর্যাপ্ত, কুমারী অকুমারী প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ন্যায় পর অপর এই দুইটী শব্দও একার্থবোধক। মনে হয় এস্থানে অ-টী নিষেধার্থক নহে, অবধারণার্থক (intensive)। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। পরশব্দের প্রাথমিক অর্থ দূর, ইংরাজী far ও fore শব্দের ইহা জ্ঞাতি। দূর হইতে অর্থ হইল দূরবর্ত্তী, পরবর্ত্তী, ভবিষ্যৎ, তাহা হইতে অর্থ হইল অন্য।

এক—নিকটবর্ত্তী, পর—দূরবর্ত্তী অর্থাৎ অন্য, তাহা হইতে অর্থ হইল অপরিচিত, তাহা হইতে অর্থ হইল শত্রু। অন্যদিকে আবার দূর, দূরতর হইতে অর্থ হইয়াছে শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ—অবর। পৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া (ইংরাজী ferry) তাহা হইতে 'পর' শব্দ আসিয়াছে।

ঋগ্বেদে (২।১২।৮) আছে—

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে
পরেইবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা
নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ।

যাঁহাকে উচ্চশব্দকারী সেনাদ্বয় দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী উভয় শত্রুই একত্র হইয়া বিবিধ-ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, দুই জনে একই রথে আরোহন করিয়া যাঁহাকে পৃথগ্‌ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

অপ-শব্দের উত্তর রপ্রত্যয় করিয়া অপর হইয়াছে। ইহা পূর্বশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার অর্থ—পশ্চাদ্বর্তী, পরবর্তী কালের, তাহা হইতে অর্থ হইল—পরবর্তী অন্য। ঋগ্বেদে আছে (১।১২৪।৯) —

আশাং পূবাসামাহসু স্বসৃণা-
মপরা পূর্বামভ্যেতি পশ্চাৎ ।
তাঃ প্রত্নবন্নব্যসীর্নূনমস্মে
রেবদুচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ॥

এই প্রাচীন ভগিনীগণের মধ্যে পূর্ববর্তিনী প্রতিদিন পরবর্ত্তিনীর পশ্চাতে আগমন করেন। এই নূতন উষারা পূর্বকালের ন্যায় এক্ষণেও আমাদিগের উপর ধন ও সুদিন বর্ষণ করুন।

উপম ও উপমা

এই শব্দ দুইটী প্রথম দর্শনে সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয়, কারণ উপমাশব্দ বহুব্রীহি সমাসের

শেষে থাকিলে উপম আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটীর মধ্যে কোন জ্ঞাতিত্ব নাই। উপ-শব্দের উত্তর ম (তম) প্রত্যয় করিয়া উপমশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ—উচ্চতম। উপ-পূর্ব্বক মা ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় করিয়া উপমা হইয়াছে। ইহার অর্থ সাদৃশ্য।

লক্ষ্মী ও Lucky

সংস্কৃত লক্ষ্মী-শব্দের সহিত ইংরাজী Luck বা Lucky শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে Lucky শব্দটী লক্ষ্মীর অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমানকালে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে কাহার না বাসনা হয়? ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের কথাও প্রায়ই শোনা যায়। লক্ষ্মী বলিলে আমরা সম্পদ্ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝিয়া থাকি। লক্ষ্মীশব্দের প্রাথমিক অর্থ কিন্তু চিহ্ন, লক্ষণ, নিমিত্ত। 'পাপা লক্ষ্মী' বলিতে অশুভ নিমিত্ত (evil omen) ও 'পুণ্যা লক্ষ্মী' বলিতে শুভ নিমিত্ত বোঝাইত। ক্রমশঃ লক্ষ্মী-শব্দের অর্থ হইল—সৌভাগ্য, সম্পদ, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বেদে যিনি ঊষা ছিলেন, পুরাণে তিনি লক্ষ্মী হইলেন। ইংরাজীতে luck শব্দের প্রথমতঃ অর্থ ছিল দৈব, ভাগ্য, যেমন good luck, bad luck, hard luck, try one's luck, as luck would have it ক্রমশঃ অধিকাংশ স্থানেই শব্দটী সৌভাগ্য অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল, যেমন to have no luck, same people have all the luck, to be in luck, to be off one's luck, for luck ইত্যাদি। Luck শব্দটী জার্মান্ ভাষায় Glueck আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবত প্রাচীন জার্মান lockon (আকর্ষণ করা, ভুলাইয়া আনা) হইতে Luck আসিয়াছে। লক্ষ ধাতু হইতে লক্ষ্মী আসিয়াছে। লক্ষ-শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। লক্ষ-শব্দের অর্থ যাহা কিছুতে আটকাইয়া থাকে অথবা আটকাইয়া দেওয়া হয়, চিহ্ন। তাহার পর অর্থ হইল যাহা লক্ষ করিয়া লোকে প্রবৃত্ত হয়, পণ। সেকালে সম্ভবতঃ লক্ষ টাকা পণ হইত। ক্রমশঃ লক্ষ শব্দের অর্থ হইল শত সহস্র।

Character ও চরিত্র

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি সংস্কৃত চরিত্র ও ইংরাজী character একই মূল শব্দের বিভিন্ন রূপ, কেন না শব্দ দুইটীর মধ্যে অর্থগত বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শব্দ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

চর্ ধাতুর অর্থ —বিচরণ করা, চলা। এই চর ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ইত্র প্রত্যয় করিয়া চরিত্র হইয়াছে। অর্থ—যাহার দ্বারা বিচরণ করা যায়, অর্থাৎ পা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ— চরণ। ঠিক এইভাবে গত্যর্থক ঋ ধাতুর উত্তর ইত্রপ্রত্যয় করিয়া অরিত্র হইয়াছে, অর্থ যাহার দ্বারা নৌকা গমন করে অর্থাৎ দাঁড়। গ্রীক্ ভাষায় ইহা আরোত্রোন্ ও লাটিন ভাষায় আরাত্রুম্ আকারে দৃষ্ট হয়। অর্থ—লাঙ্গল। বহনার্থক বহ্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া বহিত্র হয়, অর্থ—যাহা বহন করে অর্থাৎ গাড়ী। (Lat. vehiculum ইংরাজী vehicle.) ছেদনার্থক লূ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া লবিত্র হইয়াছে, অর্থ—যাহা দ্বারা ছেদন করা যায়, কাটারি। খন্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া খনিত্র হইয়াছে, অর্থ—যাহা দ্বারা খনন করা যায়। পাণিনি ইহাদের জন্য সূত্র করিয়াছেন অতিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ ৩।২।১৪৪

সুতরাং দেখা গেল চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ চরণ। বেদে আমরা এই অর্থেই চরিত্র-শব্দের প্রয়োগ পাই। যেমন, চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্—পাখীর ডানার মত বিশ্পলার পা

ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার পর চরিত্র শব্দের অর্থ হইল—কার্যক্ষেত্রে বিচরণ অর্থাৎ আচরণ, কার্য-কলাপ, ইংরাজীতে যাহাকে behaviour বা conduct বলে। সংস্কৃতে character বা স্বভাব অর্থে চরিত্র শব্দ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এই অর্থে কখন কখন চরিত্র শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই জন্য বাংলায় আমরা বলি স্বভাব চরিত্র—character and conduct.

ইংরাজীতে character শব্দটী গ্রীক্ খর্ ধাতু (kharassein) হইতে আসিয়াছে। ধাতুটীর অর্থ ধারাল করা, অঙ্কিত করা, ক্ষোদিত করা। এই ধাতুনিষ্পন্ন গ্রীক্ kharakter শব্দের অর্থ—মুদ্রিত চিহ্ন, চিহ্ন। ইহা লাটিনে character হইল। অর্থ—দাগ দিবার যন্ত্র, চিহ্ন, প্রকার, রীতি। ইংরাজীতেও প্রথমতঃ চিহ্ন, চিহ্ন অর্থে শব্দটী ব্যবহৃত হইত। বর্ণমালা বা অক্ষরকে এখনও character বলা হয়। তাহার পর অর্থ হইল বিশেষক চিহ্ন, বিশেষ গুণ। তাহার পর অর্থ হইল—বিশেষ গুণসমূহের সমষ্টি, স্বভাব, প্রকৃতি।

Butter ও Buttery

Butter (মাখন) ও Buttery (খাদ্য রাখিবার স্থান) এই দুইটী শব্দের জন্মগত কোন সম্বন্ধ নাই। যেখানে কাকজাতীয় rook-এরা থাকে তাহাকে rookery বলা হয়, যেখানে কাটিবার যন্ত্রপাতি থাকে তাহাকে cutlery বলে, যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে, আর যেখানে বোতল, পিপা, প্রভৃতি থাকে তাহাকে buttery বলে! যেখানে শুধু butter বা মাখন থাকে তাহাকে buttery বলে না, pantry-তেই butter থাকে। সুতরাং butter শব্দের সহিত buttery-র কোন সম্বন্ধ নাই। Bottle ও butler শব্দ Buttery-র জ্ঞাতি। ফরাসী ভাষার bouteillerie (যে স্থানে বোতল পিপা প্রভৃতি রাখা হয়) হইতে Buttery আসিয়াছে।

Pan ও Pantry

অনেকের ধারণা যেখানে pan বা কড়া থাকে তাহাকে pantry বলে, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ল্যাটিন panetus শব্দের অর্থ ছোট রুটি, সুতরাং যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে।

সংস্কৃত গবেষণার দু'একটী দিক

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরা-বাঁধা পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট বেষ্টনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যখন গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁদের অনেকেই গবেষণার বিষয় নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়ে যান। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের যাঁরা প্রজা, তাঁদের তো এ ভাবনার কোনও কারণ দেখি না। একদিকে বিগত দুই শত বৎসরে ভারতে অতি সামান্য, ভারতের বাইরে সংস্কৃত বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে—কিন্তু হাজার হাজার বৎসরের এ প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য—অধ্যেতার গবেষণার জন্য সত্যিকার ধ্যান ও নিষ্ঠা থাকলে, পরিশ্রম তৎপর হলে—এখনও শত শত বিষয়ে অতি অভিনব পরমাশ্চর্য ফল লাভ করা যায়।

এক কথায় বলতে গেলে ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ কাল থেকে বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ সময় পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের যে পরিপুর্তি ঘটেছে, সে বিষয়ে তো আমরা একান্ত উদাসীন শুধু নই, এখনও এক মিথ্যা ধারণার সম্পূর্ণ বশবর্তী হয়ে আছি। সাহেবেরা বলে দিয়েছেন—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে সংস্কৃতের কোনও সমৃদ্ধি ঘটেনি—সে কথাকেই আমরা বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছি। মহীধর বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা; বাঙ্গালী স্বপ্নেশ্বর —আমাদেরই বাসুদেব সার্বভৌমের পৌত্র—ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রপত্তিয়িতা—শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের টীকাকার; শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক গঙ্গাদাস সেন; আলঙ্কারিক জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ—এঁরা কোন্ যুগের লোক,—তাও আমরা খোঁজ রাখি না। ভারতের প্রত্যেকটী প্রদেশে ভারতের মধ্যদেশে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম-সূফী ধর্মের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে যে আলোড়ন-বিলোড়ন হলো—যুগযুগন্তকারী ঘটনা ঘটলো, তার কোনও স্থির সন্ধান আমাদের গবেষণার আলোকে এখনো ধরা পড়লো না।

আমাদের মনকে সমস্ত পূর্ব সংস্কার থেকে বিমুক্ত করে একবার বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার—কোন্ রসের আস্বাদন লাভ করার জন্য মহম্মদ শাহ সংস্কৃতে সঙ্গীতগ্রন্থ সঙ্গীতমালিকা, শেখভাবণ অল্লা উপনিষদ্, সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভারতের সর্বপ্রকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও সংস্কৃতরসিক খান-খানান আব্দুল রহমান খেট-কৌতুকাদি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আব্দুল রহমান সন্দেশ-রাসক এবং মহম্মদ দারা শুকোহ সংস্কৃত সমুদ্র-সঙ্গম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সঙ্গীতের মহাসাধক মহম্মদ সাহ সঙ্গীত-মালিকার প্রারম্ভেই করেছেন নৃত্যাধীশ শঙ্করকে প্রণাম। সম্রাট শাহজাহানের চোখের মণি, সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্য অধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র দারা শুকোহ ১৬৫৭ সালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সদা জাগ্রত রাখ্‌বার জন্য—যা কোনও কালে কেও করেনি, তাই করলেন। সমুদ্র-সঙ্গম গ্রন্থে বল্‌লেন তিনি—আমি দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান শ্রেষ্ঠ সুধীজনের সঙ্গে "গোষ্ঠীমকরবম্"—গোষ্ঠী করলাম, আমার হিন্দু গুরু বাবালাল এবং মুসলমান গুরু সেখ অজহারের সঙ্গে নিরন্তর ধর্মালাপ করলাম। এবং হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র অহর্নিশ আলোচনা করলাম। তারপর গভীর মননের পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে স্বরূপ অবাপ্ত বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে কোনও ভেদ নাই।—"স্বরূপাবাপ্তৌ ন কশ্চন ভেদমপশ্যাম্"। আমরা এও জানি যে এই রাজপুত্র যে উপনিষদের সুললিত সারগর্ভ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, তাই পরে ওলন্দাজ ভাষায় অনূদিত হয়ে তাৎকালিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সো পেনহাউয়ার প্রভৃতিকে কেবল বিমুগ্ধ করেনি, এই উপনিষৎ-

সমূহকেই জ্ঞানের ও শান্তির শ্রেষ্ঠ আকর বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। উপনিষদ্-গ্রন্থের ভূমিকাতেও দারা শুকোহ্-ও একই মত প্রচার করেছেন। অথচ এই মনীষিশ্রেষ্ঠই "সমুদ্রসঙ্গম" গ্রন্থ লেখার দু'বৎসর পরে ১৭৫৯ সালে দিল্লীর রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘাতকের হাতে "কাফের" আখ্যায় বিভূষিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আকবর যে সৃষ্টির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—তাঁরি প্রপৌত্র দারা শুকোহ্ তাঁর সৃষ্টি-সাধনা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা' সইলো না। ভারতের মধ্যযুগের অপূর্ব সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কেন এলো গেলো—তা' ভেবে দেখ্‌বার সময় এখনও পর্যন্ত আমাদের হলো না।

দারা-শুকোহ্ পরমধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন, তা তিনি বারে বারে ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু তিনি দু'চোখ খোলা রেখেছিলেন; অন্ধ গোঁড়ামিকে স্থান দেননি। এত বড় মহাপ্রাণ যে যুগে জন্মেছিলেন, তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে এবং অব্যবহিত পূর্ব কালে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল আমাদের দেশে? এক পূর্ববঙ্গেই তখন একশতের অধিক হিন্দু-সংস্কৃতি ভাবাপন্ন মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মহিমা কীর্তন করছেন। সেই যুগের চরগ্রামের সাধক কবি সৈয়দ সুলতান যেমন একদিকে "নবীবংশ" গ্রন্থ রচনা করছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে "যোগতত্ত্ব-নিরূপণ" এবং বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করছেন। দারা শুকোহের ভ্রাতা সুজা নানা চক্রান্তে আরাকানে প্রাণ হারান। যে মহাত্মা দৌলৎ কাজী তাঁর সঙ্গে সে সময়ে আরাকানে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি আলাওলের গুরু—সেই দৌলৎকাজিও "লেফ-চন্দ্রাণী"তে বারমাস্যায় বল্‌ছেন—

"ভাদ্রে মাসি চন্দ্রমুখী সুচরিতা কামিনী
একাকী বসতি অতিঘোরম্।
অধরো মধুরো তাম্বুল বিনা ধূসরো
নিচোল চকোর-আঁখি কোরম্
ময়নাবতি! তাজ নিজ মান পরিখেদম্॥
ভণতি কাজী দৌলত দূতী চাটুপ্রাটকৃত
সতীবর্ণে অট বিষমানম্।
লস্কর গুণমণি দানে কল্পতরু
শ্রীযুত আসরফ খানম্॥

পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ চট্টগ্রাম—বেরসাদের মুসলমান কবিবৃন্দের লেখা এ রকম সংস্কৃতবহুল শুধু নয়, স্থানে স্থানে পূর্ণ সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত। প্রায় দুই শত মুসলমান বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি সাহিত্যিক বঙ্গদেশে এই সাধনায় বিভোর, বঙ্গের বাইরে অন্যান্য বহু প্রদেশেও সেই সাধনা সমভাবে অগ্রসর হচ্ছিল।

আজ সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে ও সমস্ত সংস্কৃত রচনার মূল্যনির্ধারণের এবং তার প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয়ের দিন এসেছে। মুসলমান কবিদের সংস্কৃতবিষয়ক রচনা, সংস্কৃত-বহুল বা পূর্ণ সংস্কৃত রচনা কোন্ ভাবসম্পদের বার্তা ঘোষণা করে? কিসে তা নষ্ট হলো? তার পুনরুদ্ধারের উপায় কি?

সংস্কৃত কোনও সম্প্রদায় বিশেষের বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি নয়। ভারতের বা বহির্ভারতের প্রত্যেক জাতির পূর্বপুরুষদের অস্থিমজ্জা এ পুণ্যতোয়া সংস্কৃতভাগীরথীধারার

মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সংস্কৃত গবেষণা আরো অগ্রসর হলে এর পূর্ণতর রূপ প্রকটিত হবে। হাজার হাজার জাতির মহাযান সংস্কৃতগ্রন্থ তিব্বত, চীন, কোরিয়া, মধ্য এশিয়া, জাপান, মালয়দ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অনুবাদের মাধ্যমে বা ধর্ম-দর্শন প্রচারণার সৌকর্যার্থে প্রবন্ধ নিবন্ধের আকারে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। এখনও অনেক রয়েছে অনাবিষ্কৃত। তারপর দেড় হাজার—দুই হাজার বছর ধরে ভারতীয় সাহিত্য এ সকল এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে যে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণা জাগিয়েছে এবং নিজেও অনেক সময় অংশতঃ রূপান্তর লাভ করেছে— তার ইতিহাসও কে নির্ণয় করছে? এই অতি মনোরম বিষয় সংস্কৃত-গবেষণার আর একটী দিক। সমকালীনের অন্য কোনও পরবর্তী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ—কাশ

শরতের আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে শরতের কাশ। নীল আকাশে শুভ্র দুগ্ধফেননিভ মেঘখণ্ড আর নদীর তীরে বালুর চরে, সবুজ মাঠের ধারে শরৎ মেঘের স্বপ্ন-মাখা কাশ ফুল। কাশের সৌভাগ্য যে এই পৃথিবীর দুজন সেরা মহাকবির—কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের—মনহরণ করতে পেরেছে সে। মালবের কবি আর বাংলার কবি, দুজনেই তাঁরা কাশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। শরতের কতো গানে, কতো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাশকে অপরূপরূপে চিরন্তন করে বেঁধে রেখেছেন। কালিদাসও কাশকে কম ভালবাসা ঢেলে দেন নি, কম মাধুর্যের সঙ্গে তার ছবি আঁকেন নি। 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে ও 'ঋতুসংহারম্' কাব্যে কাশ ফুলের চমৎকার ছবি এঁকেছেন কালিদাস। 'কুমারসম্ভবম্'-এর সপ্তম সর্গে কবি পার্বতীর বিবাহ সজ্জার বর্ণনা করে বলছেনঃ—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুত্তমনীয়-বস্ত্রা।
নিবৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ।। ১১ ।।

মঙ্গল স্নানে নির্মল দেহে বিবাহের রাঙা বাস, পরিলেন প্রিয় মিলনের তরে সতী,
শুভ্রকাশের আভরণ-পরা বারিধারা-অভিসিক্তা, ধরণীর মত রাজিলেন পার্বতী।

'ঋতুসংহারম্' কাব্যের তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কাশের কথা বারবার জেগেছে কবির মনে। নব বধূ সাজে শরৎ এসেছে, তার রূপের বর্ণনা করে কবি বলছেন ঃ—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরাতনুগোত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যাঃ ॥১॥

শুভ্র কাশের অংশুক-পরা বিকচ-কমল-আননা মরালের ধ্বনি নূপুরেতে রণরণিয়া,
পক্ক ধানের শীষসম অতি-উজ্জ্বল-হেম-বরণা এসেছে শরৎ নববধূ সম সাজিয়া।

শরতে আকাশ ধরণী, বনতল, সায়র ও নদীজল কি সাজে সেজেছে, তার বর্ণনা করে কবি বলছেন—কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যা হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।

সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতানুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি, মরাল-শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুভ্রা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম ফুলেতে শুভ্র বনানী, মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্র-বরণী।

শরতের সাজের বর্ণনা করে ঋতুসংহারের তৃতীয় সর্গে কবি বলছেনঃ—

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬॥

নবীন কাশের শ্বেত অংশুক পরি
বিকশিত নীল-উৎপল-আঁখি বিকচপদ্ম-আননা,
মদ-উন্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত
শরৎ-লক্ষ্মী শুভ্র কুমুদবরণা ।।

ছয়—কুসুম্ভ

রক্ত-বরণ কুসুম্ভ হোলো বসন্তের ফুল। এ কালে নামের যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে আরো মিষ্টি কুসুম নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে বনানীতে আগুন লেগেছে। সেই আগুনের রূপ দেখে লাল কুসুম্ভ ফুলকে স্মরণ করেছেন কবি। কুসুম্ভ ফুলকে তিনি ব্যবহার করেছেন সেই দাবানলের বর্ণনায়। 'ঋতুসংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে এই বর্ণনাটি আছে ঃ—

বিকচ নবকুসুম্ভ স্বচ্ছসিন্দুরভাসা প্রবলপবনবেগোদ্ভূত বেগেন তূর্ণম।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪॥

নব-কুসুম্ভ-পুষ্প-বরণ সিন্দুর সম রাঙা
আগুন প্রবল পবনে দ্বিগুন জ্বলে,
ব্যাকুল অনল অটবীলতারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে
ধরণীরে ঘিরি দাহ করে পলে পলে।

তারপরে এসেছে বসন্ত দিন। তখন কি কুসুম্ভ ফুলকে ভুলে থাকা যায়?

বিলাসিনীদের বসনের দিকে তাকালেই তো কুসুম্ভের অবদান চোখে পড়ে। বসন্তের দিনে বিলাসিনীদের রূপ-বর্ণনা করে 'ঋতুসংহারম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস লিখেছেন ঃ—

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগ-গৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ৪॥

রাঙায়ে দিয়েছে বিলাসিনীদের চারু নিতম্ব, মরি,
নব কুসুম্ভে রাঙানো বসন আজি বসন্ত-দিনে,
কুঙ্কুমে রাঙা লঘু উত্তরী স্তন-মণ্ডলোপরি
অপরূপ কোন্ সুষমার সুর বাজিছে দেহের বীণে।

সাত—লবঙ্গ

কালিদাসের বড়ো প্রিয় ছিলো মালব্য ও মলয়স্থলী। পুগ, তমাল ও চন্দনের মতো লবঙ্গও হচ্ছে সেই মলয়স্থলীর গাছ।

মলয়স্থলীতে লবঙ্গ ফুলের রেণু-মাখা বাতাস কেমন করে প্রেয়সী নারীর ক্লান্তি দূর করতো তার মনোহর বর্ণনা আছে—কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম্ সর্গে—

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতের্ধূতচন্দনলতঃ প্রিয়াক্লমম্।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিল ॥ ২৫॥

লবঙ্গ ফুল-কেশর মাখিয়া চন্দনবন কাঁপায়ে দখিন বায়,
চাটুকার সম ঘুচাতো প্রিয়ার সুরত-ক্লান্তি মলয়স্থলী-ছায় ।।

লবঙ্গ ফুল ফোটে সাগরের দ্বীপে। সেখান থেকে সেই ফুলের গন্ধ ভেসে আসে তাল বনানীর মর্মর-মুখরিত সিন্ধুতীরে। রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস সেই সিন্ধুতীরের বর্ণনা করেছেন—অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্ম্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত স্বেদলবামরুদ্ভি ॥ ৫৭॥

তালবনানীরমর্মরধ্বনিমুখর সিন্ধুতীরে
প্রিয় সাথে বালা বিহর পরম সুখে,
সাগরদ্বীপের লবঙ্গফুল-গন্ধ বহিয়া আনি
ঘুচাবে পবন সুরত-ক্লান্তি বুকে।

আট—পুন্নাগ

পুন্নাগ হলো আমাদের নাগকেশর। এই ফুল সেদিন সাধারণ-আদৃত ছিলো বলে তো মনে হয় না। আমাদের কালেও নয়। অথচ সাধারণ-উপেক্ষিত এই ফুল কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতির দাক্ষিণ্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় নাগকেশর বারে বারে দেখা দিয়েছে। যারা চলে যাবার সময় প্রাণকে উদাস করে পাগল করে দিয়ে যায় তাদের কথা যে গানটিতে বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই গানে সেই "চলে-যাওয়ার দল"-এর মধ্যে যে "নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলার সাথে মিতা" সেও স্থান পেয়েছে।

কালিদাস নাগকেশরকে তাঁর কাব্যে একটি বার মাত্র স্থান দিয়েছেন আর সেও নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। নাগকেশরের কোন মর্যাদা কবির কাছে ছিলো না। 'রঘুবংশম্'-এর চতুর্থ সর্গে কালিদাস মত্তহস্তীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন ঃ—

খর্জ্জুরীস্কন্ধনদ্ধানাং সদোদ্গারসুগন্ধিষু।
কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ।। ৫৭ ।।

খেজুর-স্কন্দে বন্ধ মত্ত-বারণ-গণ্ড হতে,
অবিরল ধারে মধুর-গন্ধ মদধারা পড়ে ঝরি,
সেই সুগন্ধে আকুল হইয়া ব্যকুল ভ্রমর দল
পুন্নাগ ত্যজি বসিছে আসিয়া তাদের কপোলোপরি।

নয়—শেফালিকা

নাগকেশরের প্রতি উপেক্ষা না হয় ক্ষমা করা গেলো, কিন্তু শিউলির প্রতি কবির যে অনাদর, এটা কি করে ক্ষমা করা যায়? যে ফুল তার গন্ধ দিয়ে রূপ দিয়ে কঠিন-হৃদয় অ-ভাবুকেরও প্রাণের বন্ধ আগল খুলে অন্তরে পশে সেই শিউলিকে শুধু বারেকের তরে আস্‌তে দিলেন কালিদাস তাঁর কাব্যলোকে, এ বড়ো আশ্চর্য বলে ঠেকে। মনে হয় যাঁরা উপমার বস্তুগুলি পর্যন্ত ধরে বেঁধে ঠিক করে দিতেন কাব্যের সেই আচার্যদের কাছে শিউলির কোনো আদর ছিলো না কালিদাসের কালে। আর বস্তুতান্ত্রিক রাজদরবার আর বিলাসিনীরা, সূক্ষ্ম জিনিসের কদর করা উভয়েরই প্রকৃতিগত নয়। বেচারী কালিদাস! কাব্যের সংস্কার আর রাজদরবার ও বিলাসিনীদের স্থূল রুচি-বোধ—এই দুইয়ের দম-বন্ধ-করা বন্ধনের মধ্যে তাঁকে কাব্য-সৃষ্টি করতে হোতো। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হোলে কি এই সেই আট-ঘাট-বাঁধা কালের বন্ধনের মধ্যে এমন সব অনুপম সৃষ্টি তিনি কখনো করতে পারতেন?

'ঋতুসংহারম্'-এর তৃতীয় সর্গে শরতের উপবন বর্ণনা করেছেন কালিদাস। সেই বর্ণনায় কবি শিউলিকে ডেকে এনে যতো সংক্ষেপে তার সমাদর সেরে নিয়ে সরে যেতে পারেন তাই করেছেন। বল্‌ছেন কবি—

শেফালিকাকুসুমগন্ধমনোহরাণি স্বস্থস্থিতাণ্ডজকুলপ্রতিনাদিতানি।
পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি প্রোৎকন্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম ।। ১৪ ।।

শেফালি ফুলের রঙে রাঙা উপবনে
পাখির কাকলীগান উঠিয়াছে বাজি,
হরিণী-নয়ন-কমল পাইছে শোভা
পুরুষ-চিত্ত উতলা করিছে আজি।

দশ—কহ্লার

পদ্ম ও কুমুদ এরা তো অলংকার শাস্ত্র ও রাজদরবারের রুচির নির্দেশে ফুলেদের মধ্যে

অভিজাত বংশীয়। তা'ছাড়া রূপের দিক থেকে তাদের নিজস্ব দাবীও কিছুটা আছে বৈকি। তবে যতোটা প্রাধান্য তাদের দেওয়া হয়েছে ততোটা গৌরব পাবার উপযুক্ত তারা কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ আছে। কবিরা সংস্কার বশে পদ্ম বলতেই আত্মহারা, তুলনা করতে গেলেই পদ্ম এসে হাজির হয়। কালিদাসের কাব্যে পদ্মের ছড়াছড়ি—তবে সেটা লাল পদ্ম। শাদা পদ্ম, নীল পদ্ম তেমন সমাদর পায় নি তাঁর কাব্যে। 'ঋতুসংহারম্'-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কহ্লার, শাদাপদ্ম কোনো রকমে তার স্থান করে নিয়েছে। কবি বল্‌ছেন ঃ—

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্ব্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিক শীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ ।। ১৫ ।।
পদ্মকুমুদ কহ্লারে কাঁপাইয়া তাদের পরশে সুশীতল সমীরণ,
পত্রলগ্নশিশির বহিয়া আনি করে বায়ু আজ ব্যাকুল সবার মন।

এগারো—স্থলকমলিনী

একটি কবিতাতেই স্থলপদ্ম যে গৌরব লাভ করেছে 'মেঘদূতম্'-এ তা অন্য ফুলগুলির ভাগ্যে কচিৎ ঘটেছে। অলকায় প্রিয়ার ভবনে প্রিয়াকে কিভাবে মেঘ দেখ্‌তে পাবে তার বর্ণনা যক্ষ মেঘকে দিচ্ছেন। যক্ষ প্রিয়ার আর যে সব বর্ণনা 'মেঘদূতম্'-এ আছে, সেগুলি সবই শুধু নারী দেহের বর্ণনা। এই কটি লাইনে দেহের সঙ্গে মন এসে মিশেছে। দেহের ও মনের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেছে। নিছক্ দেহের গন্ধ একেবারেই নেই এই লাইনগুলিতে, আছে শুধু স্নিগ্ধ বেদনার মধুর প্রশান্তি।

'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘের সেই কবিতাটি হচ্ছে—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরাঞ্জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব প্রীত্যা গতমভিমুখম্ সংনিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাত্ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ৩১ ॥
বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ প্রবেশি কক্ষে জাগাবে যখন অমৃত-শীতল-নেশা,
অতীতের প্রীতি স্মরি তার পানে ধাইবে সহসা প্রিয়ার দুইটি আঁখি
কি পরিয়া মনে থামিবে সহসা, বেদনা-সিক্ত ঘন পল্লবে নয়ন দুইটি ঢাকি,
মনে হবে যেন বাদল দিনের স্থলকমলিনী জাগা-না-জাগায় মেশা।

বারো—কুন্দ

কুন্দ কবির সোহাগ পেয়েছে। 'মেঘদূতম্', 'ঋতুসংহারম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', এই কাব্য ও নাটিকাগুলিতে কুন্দ তার সৌন্দর্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে মহাকবির কাছ থেকে। চর্মণ্বতী নদী পার হয়ে মেঘ যখন দশপুর জনপদে যাবে তখন দশপুর বধূদের ভ্রূবিলাসচাতুরী দেখবার সৌভাগ্য তার হবে। 'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘে এই দশপুরবধূদের অপাঙ্গ-লীলার অপূর্ব বর্ণনা আছে। কবি বলছেন—

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমানাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসত্কৃষ্ণশারপ্রভানাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্দশপুরবধূনেত্রকৌতুহলানাম্ ।। ৪৭ ।।
চর্মণ্বতী পার হয়ে মেঘ, যেও আনন্দে সেই দশপুর পানে
যেথা বধূদের ভ্রূলতা-বিলাস মনোহরা লতা সম শোভে সর্পিলা,

যবে কুতুহলে তারা কালো-পল্লব আঁখি তোমা পানে হানে,
মনে হয় যেন নব-প্রস্ফুট শুভ্র কুন্দফুলে কালো মধুপের নয়ন-ভোলানো লীলা।

তারপরে মেঘ যখন অলকায় পৌঁছবে তখন যে রমণীদের দেখবে তারা যে সৌন্দর্যে আর সব নারীদের হার মানাবে অন্তত কাব্যের ও যক্ষের খাতিরে সেটা তো আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি। কাব্যটি হচ্ছে বিরহী যক্ষ ও তার প্রিয়াকে নিয়ে। যে প্রিয়ার জন্যে যক্ষের এতো ব্যাকুলতা, যার জন্যে মেঘকে পর্যন্ত সে সন্দেশবাহীর কাজে লাগিয়েছে সেই প্রিয়া তো অলকার নারী। তাই অলকা-র সাধারণ নারীরা যে কি অপরূপ সুন্দরী সেটা তো জানাতে হবে, তবে তো তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তমা সেই যক্ষ-প্রিয়ার অতুলনীয়তা আমাদের বোধগম্য হবে। তারপরে যাকে দিয়ে খবর পাঠাতে হবে, অলকাপুরী-সুন্দরীদের অনুপম রূপের বর্ণনা দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করা তো প্রাচীন ও নবীন কোনো চাতুর্য-বিধি-বহির্ভূত নয়। এই নিরপরাধ ডিপ্লোমাসির জন্যে যক্ষকে দোষী করা কোনো মতেই চলে না। 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে অলকা-পুরবাসিনীদের এই মোহন বর্ণনা যক্ষ করছেন—

হস্তেলীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ৬৫ ॥
বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব-কদম্ব দোদুল।

এ ছাড়াও 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে "আশ্বাশৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং শখীমুতে ইত্যাদি যে চারটি লাইন আছে তাতেও "প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলংজীবিতং ধারয়েথা"।
এই লাইনে কুন্দ ফুলের বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। তাই এই শ্লোকটির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত দিলুম।

শীতের অবসানে বসন্তের কুন্দ ফুল দেখা দিয়েছে। ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় কালিদাস কুন্দের শুভ্রতাকে বিলাসিনী নারীর হাস্যের মতো শুভ্র বলে বর্ণনা করেছেন। বিলাসিনী নারীর হাসি যে কি করে শুভ্র বলে ঠেকেছিলো মহাকবির চোখে তা বোঝা গেলো না। কুন্দ লাঞ্ছিত হোলো এই ব্যর্থ তুলনায়। শ্লোকটি হচ্ছে এই

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূ-হসিতাবদাতৈরুদ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্ ।। ২২ ।।
মিলন-পিয়াসী রমণীর হাসি শুভ্র কুন্দফুল,
আজি সুন্দর উপবনে ওঠে ফুটে,
নিস্পৃহ-মুনি চিত্তটিরেও হরিছে কুন্দ ফুল
ভোগী-যুব-হিয়া আগেই নিয়েছে লুটে।

ঋতু-সংহারম-এর ষষ্ঠ সর্গে নিম্ন-লিখিত এই শ্লোকটিও পাওয়া যায়। এটি কালিদাস রচিত নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এই শ্লোকটিতে কুন্দ ফুলের উল্লেখ আছে।

পরভৃত- কলগীতৈহর্লাদিভিঃ সম্বচাংসি
স্মিতদশনময়ূখান্ কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ।
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রুমাভৈর
উপহসতি বসন্তঃ কামিনীনামিদানীম্ ।।
মধুর কোকিলকূজনে নারীর মধুর কণ্ঠধ্বনি
হাসিমাখা চারু দশনের শোভা বিকচ কুন্দফুলে,
সুন্দর করপল্লবশোভা নবকিশলয় দলে,
আজি বসন্ত এদেরে দেখায়ে উপহাসে নারীকুলে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা মালবিকার রূপ-বর্ণনা করছেন—শাদার সঙ্গে ঈষৎ হলুদে মেশানো মালবিকার কপোলদুটির রঙ। রুচি তার এমনি মার্জিত যে সে বাহুল্যের দিকে কখনো যায় না, কখনো বেশী অলংকারে সাজায় না তার দেহ। বলছেন রাজা—

শরকাণ্ডপাণ্ডু গণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা,
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয় কুসুমেব কুন্দলতা ॥
শরবৃক্ষের কাণ্ডের মতো পীতাভ কপোল-শোভা,
পরিমিত-আভরণা সুন্দরী যৌবনভারনতা,
যেন চৈতালি রোদে হলুদ-বরণ-পল্লব মনলোভা,
স্বল্প-ফুলের-আভরণ-পরা তন্বী কুন্দলতা।

দুষ্মন্তের সভায় যখন শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলা এসে হাজির হয়েছেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটিকায় পঞ্চম অঙ্কে কালিদাস সেই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। দুর্বাশার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়-লীলা ভুলে গেছেন। অম্লান-লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে দেখে রাজা আকুল হয়েছেন অথচ স্মরণ করতে পারছেন না এই নারীকে। মন সন্দেহে দোলায়িত। একে নিতেও পারছেন না, বিদায় দিতেও প্রাণ চায় না। ঠিক যেমন ভ্রমর কুন্দকোরকে বসতে চায়, কিন্তু শিশিরে কোরক পূর্ণ থাকায় সেখানে বসতে পায় না, চারিদিকে ঘুরে মরে। দুষ্মন্ত বলছেন—ইদমুপনতমেবং রূপমাস্পৃষ্টকান্তি

প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যব বসন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ ।।
অম্লান-রূপলাবণ্যভরা এই সুন্দরী নারী
ছিল কি আমার কিম্বা ছিল না সন্দেহ মনে জাগে.
যথা শিশিরপূর্ণে কুন্দ-কোরকে ভ্রমর বসিতে নারে
সেই মত এরে নিতেও পারি না, ছাড়িতে যে ব্যথা লাগে।

বিক্রমোর্বশীয়ম্-এ মাধবী লতা ও কুন্দলতার কথা আছে, কুন্দ ফুলের কোনো উল্লেখ নেই। বাতাস মাধবীলতা ও কুন্দলতাকে কম্পিত করছে, নৃত্য-ছন্দে দোলাচ্ছে, বাতাসের এই কৌতুক-লীলা তার স্নেহ ও দাক্ষিণ্য বলে বোধ হচ্ছে। বাতাস যেন প্রেমিক, মাধবী ও কুন্দকে নিয়ে তাই এই খেলা। বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে পবনের এই লীলা লক্ষ্য করে রাজা

বিদূষককে বলছেন—নিষিঞ্চন মাধবীমেতাং লতাং কৌন্দীং চ নর্তয়ন।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে ।।

কম্পিত করে মাধবীলতারে বায়ু,
কুন্দলতারে দোলায় নৃত্য-তালে,
বাতাসের লীলা দেখে মনে হয় বাতাস প্রেমিক বুঝি
স্নেহ-উদারতা তাই লতা-পরে ঢালে।
তেরো—লোধ্র

সৌন্দর্যের সঙ্গে উপকারিতার যোগ সব সময়ে থাকে তা ধর্মবুদ্ধি থাকলে সব সময়ে বলা যায় না। তুলনায় বহু-প্রচারিত মাকাল ফল তার সর্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত। লোধ্র কিন্তু এ দোষে দোষী নয়। লোধ্র ফুল দেখতেও যেমন সুন্দর, কাজেও তেমনি আসে। তার রেণু পাউডারের মতো করে মুখে মাখতেন সে যুগের সুন্দরীরা। লোধ্র ফুলের রসও সুন্দরীরা মুখে মাখতেন। তাতে তাঁদের পাণ্ডুর মুখ শুভ্র দেখাতো। 'ঋতুসংহারম্'-এর চতুর্থ সর্গে হেমন্ত-বর্ণনায় কবি বলছেন—

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ
প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো
হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্ ।। ১ ।।
নবকিশলয়ে সুন্দর আজি তরুদল প্রান্তরে
পাকিয়াছে ধান, লোধ্র কুসুম-নত
বিলীন হয়েছে সায়রে পদ্ম, পড়িছে তুষার ঘন,
হেমন্তকাল আজি প্রিয়ে সমাগত।

'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের সপ্তম্ সর্গে পার্বতীর গৌর বরণের অনুপমতার বর্ণনা করে কালিদাস বলছেন যে এমন উজ্জ্বল উমার শুভ্র দেহ-কান্তি যে ঝল্‌সে যেতো চোখ, কেউ তাকাতে পারতো না তাঁর দিকে যদি না কানের যবাঙ্কুরের আভরণ সেই শুভ্রতাকে সহনীয় করে তুল্‌তো। বলছেন কবি—

কর্ণার্পিতোলোধ্রকষায়রুক্ষে
গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্
ববন্ধ চক্ষুর্যব পরোহঃ ।।
কপোল দুইটি রুক্ষ উমার লোধ্র ফুলের রসে,
অতীব শুভ্র হইল কপোল গোরোচনা-অবলিপ্ত,
তাকানো যায় না কপোলের পানে এমনি উজল-শুভ্র,
যব-অঙ্কুর কর্ণে পরায় নয়ন হইল তৃপ্ত।

বিবাহের মঙ্গল-স্নান করাবার জন্যে উমাকে নিয়ে চল্‌লো সখিরা। কতো তার আয়োজন। তার বর্ণনা করে কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম্ সর্গে কবি বলছেন—

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলা—
মাশ্যান কালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং
নার্যশ্চতুষ্কাভিমুখমনৈষুঃ॥
লোধ্রফুলের তৈল মাখালো উমার কোমলদেহে
কালেয়-রচিত অঙ্গরাগটি অনঙ্গ-মন টানে,
স্নানের বসনে সাজায়ে উমারে সযতনে সখিদল,
নিয়ে চলে তারে মহা-আনন্দে ধারামণ্ডপপানে।

সুন্দরীদের মুখ-শ্রীর বর্ণনায় লোধ্রকে বাদ দেবার যো নেই। শুধু আমাদের এই মর্তলোকের সুন্দরীদের নয়, অলকাপুরীর সুন্দরীদের লাবণ্য ম্লান ঠেকবে রসিকদের নয়নে যদি না লোধ্র ফুলের রেণু তাঁরা মেখেছেন এটি আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া হয়।

কবির কল্পনা কোনো বাঁধন মানে না। পাটল রঙের বনভূমিতে সিংহ বিরাজমান। এই ছবিটি কবির মনে আর একটি ছবি সৃষ্টি করলো— পাহাড়ের পাটলবরণ অধিত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে লোধ্র তরু ফুল্লকুসুমে ভরা। 'রঘুবংশম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে এই শ্লোকটি আছে—

স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং
ধনুর্ধর কেসরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাং
লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্ ।। ২৯ ।।
হেরিলেন তবে মৃগয়াভিলাষী নৃপতি ধনুর্ধর
রক্তবরণ বনভূমিতলে সিংহ বিরাজ করে,
যেন পাহাড়ের পাটল-বরণ উচ্চভূমির পর
ফুটিয়া উঠেছে লোধ্র বৃক্ষ নবকুসুমেতে ভরে।

শুধু কি তাই? রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সন্তান-সম্ভবনা হয়েছে। কৃশ তাঁর দেহ, মুখখানি পাণ্ডুর। সেই পাণ্ডুর মুখ লোধ্র ফুলের পাণ্ডুর রং মনে পড়িয়ে দিলো। 'রঘুবংশম্'-এর তৃতীয় সর্গে সুদক্ষিণার এই বর্ণনা আছে—

শরীর সাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যতে লোধ্র-পাণ্ডুনা।
তনু-প্রকাশেন বিচেয় তারকা
প্রভাতকল্প শশিনেব শর্বরী ॥ ২ ॥
স্বল্পাভরণা সুদক্ষিণার কৃশ মধু-তনুখানি,
পাণ্ডুর মুখ লোধ্র ফুলের পাণ্ডুতা নেছে হরি,
এ মধুর রূপ হেরি মনে হয় যেন এই অঙ্গনা
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আসন্ন-ঊষা তারাহীনা শর্বরী।

(ক্রমশঃ)

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

মডেল

রোপো, অর্ভোয়ার্ আদেম্যাঁ ১ —সকলেই চলে গেছে। আমার আর মার্থের কাজ কিছু বাকি পড়ে যাওয়ায় আমরা আতলিয়েতে সেদিন রয়ে গেছি। হঠাৎ আকস্মিক প্রশ্ন এল, 'তোমার দুঃখটা কিসের?' ভাবছি কথাটা মার্থ না আর কেউ বললে। তার গলার আওয়াজ চেনবার সুযোগ আমার আগে হয়নি। আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। জবাব দিলাম না মাদ্ময়জেল্ আমার কোন দুঃখ নেই। সে বললে 'তবে তুমি এত চুপ চাপ কেন?' জানালাম—কথা বললে হবে পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে হবে নিমন্ত্রণ এবং সে নিমন্ত্রণের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই বলে, থাকি চুপচাপ। কিন্তু তুমি যে চুপ ক'রে থাকো, তা নিশ্চয়ই কোথাও ঘা খেয়েছ ব'লে।' সে বললে 'আমি ঘা খেয়ে নির্বাক হয়েছি তা তোমাকে জানিয়েছে কোন্ পণ্ডিতে?' বললাম পণ্ডিতে বলেনি—তুমি এইমাত্র বললে যে আমি চুপচাপ থাকি আমার দুঃখটা কিসের? কাজেই বোঝা যাচ্ছে তোমার ধারণায় দুঃখ না পেলে কেউ হয় না পরিচয় নিসক্ত—নীরব।' তার জবাব এল 'পরিচয় চাও না, তাহলে নিজেকে নিয়ে কাজের ফাঁকে কর কি?' উত্তর দিলাম 'স্যোন্ নদীর পারে ঘুরি আর হাওয়া খাই। আর রবিবার যাই লুভ্র্-এ। এ দুটোই পাওয়া যায় বিনামূল্যে। সে বললে 'বেশ বেশ, আমিও যাই লুভ্র্ এ আর স্যোন্এর ধারে হাওয়া খাওয়া আমারও অভ্যেস আছে। এ দুটোরকোনটায় যদি তোমাকে কোনদিন নিমন্ত্রণ করি তাহলে তার প্রতি নিমন্ত্রণ দিতে বোধহয় তোমার পকেট খালি হবে না।' চম্কে গেলাম। ভাবলাম এই কি সেই,—খ্যাপা কুকুরের চেয়ে যার বিষ বেশী? সে ব'লে চললো! কিন্তু এই নিমন্ত্রণের একটি সর্ত আছে। সেটা হচ্ছে যে, আমরা কেবল পরিচিতের গণ্ডির মধ্যে রেখে দেব এই আমন্ত্রণ। তার বাইরে যেন যেতে চেষ্টা ক'র না এবং সেই ইংগিত কোন দিন পেলেই আমাদের এই নিমন্ত্রণ ও প্রতি নিমন্ত্রণের হবে সমাপ্তি। বেশ অব্যাহত ভাবেই বললাম 'ভয় নেই মাদ্ময়জেল্, আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চুক্তিহীন নিমন্ত্রণ ঘটে ওঠে না। তাই তোমার দেওয়া গণ্ডীকে ডিঙ্গিয়ে যাবার প্রচেষ্টা আমার দিক থেকে হবে না। কারণ এতে হবে আমার সংকোচ ও ভয়।' সর্ত রইল যে আতলিয়েতে আর কাউকে আমরা জানাব না এই নিমন্ত্রণের কথা, কারণ তারা জানলেই, করবে কানাকানি, হবে নির্লজ্জ রহস্য।

এর পর কয়েকদিন ধ'রে আতলিয়েতে এক গোলমাল উপস্থিত হওয়ায়, আমরা প্রায় ভুলে গেলাম একসঙ্গে বেড়ানোর নিমন্ত্রণ। ডাগারম্যান্ মোমার্তএ দেখেছিল দুটি জিপ্সী মেয়েকে। তারা পথচারীদের হাত দেখে পয়সা ভিক্ষে করছিল, ডাগারম্যান্ তাদের একজনকে কাজ দেবে বলে এনেছে আতলিয়েতে। যখন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে সে থ্রোনের উপর দাঁড়াবে সম্পূর্ণ নগ্না এবং তাকে দেখে আমরা গড়ব মূর্তি, তার হাতের রেশমী রুমালখানা অস্ত্রের মত আমাদের সামনে নেড়ে, রুমানি ভাষায় অনর্গল কত কি বল্ল। ভংগি আর আওয়াজে আমরা বুঝলাম যে সে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। সজোরে মাটিতে পা দু' একবার ঠুকে সে চল্ল দরজার দিকে। সেই মুহূর্তে ডাগারম্যান ছুটে মেয়েটির সামনে গিয়ে তার বিরাট বাহুদ্বয় প্রসা-

রিত ক'রে হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে এবং অভিনয় কেতাদুরস্ত চালে বল্‌ল, 'মাদ্‌ময়জেল্‌ যাচ্ছ কিন্তু যাবার আগে আমার বুকে একটা ছুরি মেরে আমাকে শেষ করে দিয়ে চলে যাও।' মেয়েটি তাকে ঠেলে সরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেই বপুর পাহাড়কে নড়াবার ক্ষমতা তার ভুজলতায় ছিল না। ডাগারম্যান বলে চলেছে, 'যবে থেকে তোমায় দেখেছি মোমার্তএ, আমার চোখে ভাস্‌ছে আধুনিক ভেনাসের মূর্তির ছবি এবং সে মূর্তি হচ্ছে তুমি। আমরা বেশী তো কিছু চাইনা তোমার কাছ থেকে মাদ্‌ময়জেল্‌, কেবল চেয়েছি একটু তোমার অনবদ্য রূপের দর্শন। ভেবে দেখ, আজ কত শত বৎসর ধ'রে লোকে মিলোর ভেনাস্‌কে অর্পণ করে রূপদৃষ্টির অর্ঘ ও মুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি। তোমায় দেখে আমি যে মূর্তি গড়ব, আশা করি যখন তুমি থাক্‌বে না বা আমিও থাকবো না, এ জগতে থেকে যাবে শুধু আমার সাধনা ও তোমার রূপের মিলন, যা তৃপ্ত ক'রবে কত শত বৎসরে কত সহস্র রূপপিপাসুদের। দেখ না আমরা সবাই সৌন্দর্যের পূজারী আমরা শুধু পুরুষের দল হ'লে না হয় তোমার বলবার কিছু কারণ থাকত কিন্তু ঐ দেখ না আমাদের মধ্যে মেয়েরাও এক সাথে একই কাজ করছে'—ব'লে ডাগারম্যান মার্থএর দিকে হাত দেখাল এবং সেই সংগে তার চোখ যেন মার্থকে বল্‌ল 'দোহাই তোমার, বেয়াড়া একটা কিছু ব'লে সব পণ্ড ক'রে দিও না।' সকলকে অবাক ক'রে 'নির্বাক মার্থ' বল্‌ল—'ডাগারম্যান ঠিকই ব'লেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল রূপের সৃষ্টি করা এবং তার আয়োজনে সমাজগত শ্লীলতা ও আচারের সংকীর্ণ গণ্ডীকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে তাদের —যাদের আদল থেকে চয়ন করে পরিস্ফুট হবে শিল্প, ' সে আরও ব'লে চল্‌ল, 'এই ধর না গোয়্‌য়ার তৈরী নগ্না এল্‌বার ডাচেস্‌। যাদের সামাজিক রুচি তুলে ধরে নিষেধের যষ্টি, তাদের মতেই প্রমাণ চেষ্টা চলে, এ ছবির নায়িকা ডাচেস্‌ নয়। আমি বলি গোয়্‌য়ার সংগে গুপ্ত প্রেমকে চরিতার্থ করবার জন্যে ডাচেস্‌ গোপনে দেখাননি শিল্পীকে তাঁর নগ্ন দেহ। তিনি চেয়েছিলেন বহুযুগ ধ'রে বহুজন দেখবে, শিল্পীর চোখে ধরা তাঁর নগ্ন দেহের মাধুরী।' 'ব্রভো' ব'লে ডাগারম্যান তার দিকে এগিয়ে গেল তার অভ্যাস মত বক্তার পিঠে বিরাশী সিক্কার চাপড় দিয়ে তারিফ জানাতে কিন্তু মার্থএর উদ্যত তর্জনী যেন তাকে ধাক্‌কা মেরে থামিয়ে দিল। 'থাক্‌ ম'সিয়ো, আমার যা বিশ্বাস তাই বলেছি, তোমার তারিফ দিতে হ'লে অন্যকে দিও।'

মেয়েটি এসব নাটকীয় কথা বুঝল কি না জানি না। সে হঠাৎ ফিরে এল। থ্রোনের উপর লাফিয়ে চ'ড়ে ক্ষিপ্র হস্তে তার সব কাপড়গুলি খুলে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর দু'হাতের আঙ্গুল চালিয়ে খোঁপা দিল এলিয়ে এবং সজোরে থ্রোনের উপর পা ঠুকে চেঁচিয়ে বলল—'নাও কর শিগ্গির তোমার ভেনাস্‌।' তারপরে প্রায় অস্ফুট স্বরে বল্‌ল, 'যদি ফ্লোরিয়ান্‌ জানতে পারে যে আমি এতগুলি পুরুষের সামনে দাঁড়িয়েছি ভেনাস হয়ে—যে ছুরি তোমার বুকে বসাতে বলেছিলে ম'সিয়ো, সে তা আমার বুকে হাতল পর্যন্ত বসিয়ে দেবে।'

সেদিন আতলিয়ে বন্ধ হবার সময়ে মার্থকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা মাদ্‌ময়জেল, তুমি ডাচেস্‌ এল্‌বা হ'লে কি করতে?' সে ব'ললে, 'আমি গোয়্‌য়াকে আঁকতে বলতাম আমার নগ্নরূপ এবং ছবি শেষ হলে আমার ভৃত্যদের হুকুম দিতাম আমার সামনে শিল্পীকে ধরে অন্ধ ক'রে দিতে, যাতে সে যতদিন বেঁচে থাকে—তার চোখের সামনে ভাসবে কেবল আমার রূপ এবং জগতও জান্‌বে যে গোয়্‌য়ার আমি শেষ ও একমাত্র নায়িকা।' মনে মনে বল্‌লাম 'ভাগ্যিস্‌ তুমি ডাচেস্‌ হওনি বেচারি গোয়্‌য়া খুব বেঁচে গিয়েছেন।'

আতলিয়েতে আন্তর্জাতিক মডেলদের সুন্দরের হাটে জিপ্‌সী আদেলিতার দেহের গঠন

ও লালিত্যের আভা আর সকলের রূপকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল। তার মাথায় এক ঝিণুকে জল ঢাল্‌লে নিম্নগামী সে জলের ধারা বহমান রেখায় দেখাত উচ্চ অনুচ্চ দেহের সকল গঠনের অতুলনীয় আদর্শ সমন্বয়। অনতিরিক্ত মেদ, ঋজু ও সুঠাম এই দেহের কোথাও কাঠিন্যের আভাস মাত্র ছিল না। বেতসের মত নমনীয়তা থাকলেও এ শরীরে তেজ ও শক্তি যেন উপ্‌চে উঠছিল। এ হেন দেহবল্লরীতে বৃন্তান্তের ফুলের মত তার মুখখানা, সুগঠন চোখ নাক ও ওষ্ঠ বিম্বাধরে লালিত্যের টল্‌টলে মধুক্ষরণ করত। তার আদর্শে মূর্তি গড়া পিগ্‌মেলিয়ানের গ্যালাটিয়াকে প্রাণ দেওয়া নয়; এ যেন তার রূপের সোনার কাঠিটি ছুঁইয়ে পিগ্‌মেলিয়ান চাইছে অন্তরে সুপ্ত রাজপুত্তুর ও পক্ষীরাজকে জাগিয়ে রূপকন্যার মালা পেতে সাগর জঙ্গমে পাড়ি দিতে।

ডাগারম্যান অনেক সময় কাজ থামিয়ে মুগ্ধ নয়নে তার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকত। মার্থ একদিন ঠাট্টা ক'রে তাকে বলল, 'অত ক'রে ওর দিকে চেয়ে থাকলে, তোমার দৃষ্টির তাপে একদিন বেচারী গ'লে যাবে।'

আতলিয়েতে স্কেচিং ও পেন্ট-এর জন্য যত মডেলের প্রয়োজন তারা প্রতি সোমবার আমাদের আতলিয়েতে আসত মনোনীত হ'তে। আদেলিতাকে নিয়ে আমরা দু' সপ্তাহ কাজ করেছি এবং সোমবার আসায় সকাল আট্‌টা থেকে কর্মপ্রত্যাশী পুরুষ ও মেয়ে মডেলদের ভীড় লেগে গেছে। হঠাৎ সুষ্ঠু সবল ও রোদে-পোড়া তামাটে রঙের একটি যুবক ঝোলা নীল রেশমের সার্ট পরে হাজির হল। তার কাল তেল চুপ্‌চুপে চুলে টেরি কাটা, লম্বা জুল্‌পি ও ইস্পাতের ফলার মত ধারাল চাহনি দেখে কারোর বুঝতে বাকী রইল না যে, সেও জিপ্‌সী। আদেলিতা তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু সে এক লাফে তার পাশে গিয়ে তার হাত শক্ত ক'রে ধরে বললে,—'আদেলিতা, এখানে কি করছিস?' সে জবাব দিল যাই করি না, তুমি এখানে কেন?' লোকটি একবার সবায়ের দিকে জ্বলন্ত চাউনি দিয়ে বললে 'বুঝেছি, তুই এখানে মডেল হয়েছিস। গত দু'সপ্তাহ ধ'রে মনোলিতা একা মোমার্থে হাত দেখে বেড়াচ্ছে, আর তোর কথা জিগ্যেস করলেই সে বলে, তুই মোঁপারনাস্‌এ কাজ নিয়েছিস। লজ্জা করে না তোর এতগুলো লোকের সামনে উলঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াতে? তুই যখন আমার স্ত্রী হবি এবং তোর ছেলেরা যখন শুনবে যে তাদের মা নির্লজ্জের মতো বস্ত্রহীনা হ'য়ে বাজারে দাঁড়াত, তখন কোথায় আমি মুখ দেখাব? ' আদেলিতা তখন গলা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে আরম্ভ করেছে, 'আমার ছেলেরা কি ভাববে, সে খোঁজে তোর দরকার নেই—আর তোকে যে আমি তাদের পিতার অধিকার দেব,—এ তোকে কে বলেছে? আমায় দেখে এরা গড়ছে ভেনাস্‌, আর তোকে দেখে এরা কি গড়বে? — বোধহয় চোরের সর্দার।' আমরা সবাই বুঝলাম ইনি ফ্লোরিয়ান্‌। ততক্ষণে তার রাগে মাথায় রক্ত চড়েছে। সে আদেলিতাকে জাপ্‌টে ধরে তার নিতম্ব দেশে দ্রুত চপেটাঘাত বর্ষণ শুরু করল। হট্টগোল চারিদিক মুখর ক'রে তুলল এবং সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছিল ফ্লোরিয়ানের গর্জন ও আদেলিতার গালি। 'এ্যাম্বেশিল্‌, শালো, সোভাজ্‌ ইত্যাদি। সারা আতলিয়ের তত্ত্বধায়িকা মাদাম রোজ্‌ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন 'সিলাঁস্‌ সিলাঁস— ম'সিয়ো হেন্রিক্‌ আসছেন। ভীড় করা পুরুষ মেয়েরা দুপাশে সরে রাস্তা করে দিল, আগত প্রফেসার হেন্রিককে। তিনি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন এত গোলমাল কিসের?' ফ্লোরিয়ান্‌ ও আদেলিতা ঝগড়া থামিয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখিয়ে স্বল্প কথায় তাঁকে জানানো হল যে তারাই এই অস্বাভাবিক গোলমালের জন্য দায়ী। তিনি তাদের সদর দরজা দেখিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও এখনি কক্যাঁরা, একি মোমার্তএর খুনে গলি পেয়েছ?' তারপর মাদাম রোজকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'এসব ছুট্‌কো বাজারে--মডেলদের যেন আর আতলিয়েতে

চুকতে না দেওয়া হয়।' প্রফেসার হোর্ণরকের কথায়, ফ্লোরিয়ান্-এর রোষ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্ল, কিন্তু তার উত্তাপ পেল কেবল আদেলিতা। সে প্রায় তাকে কাঁধের উপর ফেলে বল্তে বল্তে চল্ল 'শয়তানী, তোর জিব কেটে দেব, যাতে আর কোনদিন না বলতে পারিস, তোর সন্তানরা কোন পিতার জিম্বায় থাকবে।'

আমরা সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। যে আশা ও উদ্যমে আরম্ভ করেছিলাম আদেলিতার মূর্তি তাকে অসমাপ্ত ও ব্যাহত ক'রে সে চ'লে গেল। আমরা সকলেই ভাবলাম বেচারা ডাগারম্যান বোধহয় তার বিচ্ছেদে মুষ্ড়ে পড়বে। কিন্তু সে হঠাৎ সারা আতলিয়েকে অট্টহাসে কাঁপিয়ে দিল। হাসির গমক থামলে সে বলল, 'আমাদের ভেনাস গড়া শেষ হল না, কিন্তু নানেৎ যে আমাকে ধম্কে শাসিয়ে কর্তৃত্ব ফলায়, এই উপলক্ষ্যে তার প্রতিকারের একটা পথ আজ জানলাম।'

মডেলদের সম্বন্ধে যে চলিত ধারণা আছে, আমারও তাই ছিল যে—তারা সমাজ-বর্জ্জিত অখ্যাত শ্রেণীর থেকে আসে শিল্প কর্মশালায়, অর্থলুব্ধ হয়ে। তাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শ্রেণীর রুচির ও কৃষ্টির তফাৎ আছে তা আতলিয়েতে যোগদান করবার আগে আমার ধারণা ছিল না। যাদের উদ্দেশ্যে প্রফেসার হোর্ণরিক 'ছুট্কো' মডেল ব'লে তাঁর বিরাগ প্রকাশ করলেন, তাদের মধ্যেই দেখা যায় জিপ্সী, রাস্তার বারাঙ্গনা, উঞ্ছবৃত্তিজীবী ট্রাম্প্ ও রেফ্যুজিরা যারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় সুযোগ পেলে হয় মডেল। কিন্তু বেশীর ভাগ আতলিয়েতে ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত কর্মশালায় পেশাদারী মডেলরাই কাজ পেয়ে থাকে। এদের অনেকে মডেল হয়েছে বোধহয় প্রথমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কিন্তু পরে শিল্প সৃষ্টির মজায় মজে আতলিয়ের আবহাওয়া ও রূপচর্চার আনন্দটাই তাদের জীবনে বেশী প্রাধান্য এনে দিয়েছে। অনেকে শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে তার অনুরাগে হ'য়েছে মডেল। চতুর্দশ শতাব্দীর ফ্রা ফিলিপো লিপ্পি ও নান্ বুত্তির মতো প্রেমাভিনয় আজও চ'লছে ইয়োরোপে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

ফ্রান্সের কোন অখ্যাত গ্রাম থেকে তরুণী সুজান্ ভালাদ' ভাগ্যান্বেষণে সহরে এসে পড়েছিল সার্কাসের ট্রাপিজ খেলোয়াড় হিসাবে, কেবল দৈবক্রমে মাটিতে পড়ে ভগ্নাঙ্গ হওয়ায় ভালাদ' সে পেশা ছেড়ে হ'ল মডেল। তাও অর্থের কারণে নয়, কোন এক শিল্পীর প্রেমে পড়ে। তারপর আর আদলকে নিয়ে শিল্প রচনায় উৎসুক হ'ল প্রায় ডজন খানেক 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য শিল্পরথীরা। পিসারো রোনোয়া, দ্যোগার-ও নাম সেই তালিকায় দেখা যায়। তরুণী ভালদ'র হ'ল সন্তান এবং কোন্ শিল্পী যে তার পিতা তা কেউ জানে না। শিল্পী উত্রিল্লো তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করায়, সে আজ মরিস উত্রিল্লো নামে পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী। ভালাদ' শুধু শিল্পী-দের মডেল হয়েই জীবন কাটাননি। তাদের দেখাদেখি তিনিও করেছিলেন শিল্পের প্রচেষ্টা এবং তাঁর করা ছবি আজ প্যারীর বিখ্যাত আধুনিক শিল্প সংগ্রহশালা মুজে দার মদার্ন্-এর একটি বিশেষ কক্ষে অন্য বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের মহলে দক্ষতার সঙ্গে পড়শী হ'য়েছে। ভালাদ' ছন্নছাড়া মদ্যপ ও অর্দ্ধউন্মত্ত মরিস্কে ঘরে তালাবন্ধ করে শিল্পে নিযুক্ত না করলে আজ জগৎ পেত না এই শিল্পীর দান।

পিতৃদত্ত সামান্য ধন নিয়ে পোলিশ মহিলা জেন্ভিয়েভ্ সোফি ব্রেজ্কা এল প্যারীতে লেখাপড়া করতে। সেই কেবল দেখল ভাগ্যভ্রষ্ট ফরাসী যুবক আঁরি গদিয়ের-এর মধ্যে বিরাট শিল্পীর উন্মেষ। সে একাধারে মাতা, সঙ্গিণী, পেট্রোন্, প্রণয়িনী ও মডেল হয়ে চাইল যাতে শিল্পী গদিয়ের-এর শিল্প সাধনা হয় সম্পূর্ণ। গোদিয়ের প্রণয়ে কি কৃতজ্ঞতায় নিল ব্রেজ্কার নাম নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে। সে যদি অকালে নিজ দেশপ্রেমে মেতে প্রথম মহাযুদ্ধে

মাত্র তেইশ বছর বয়সে প্রাণ না হারাত তাহলে জগৎ আজ পেত বিংশ শতাব্দীর এক সেরা শিল্পীর সম্পূর্ণ দান। ব্রেজ্কা তার প্রতিভা ঠিকই ধরে ছিল। গোদিয়ের-এর মধ্যে যে শিল্পী ছিল তার বিরহে কিংবা প্রণয়ীর বিচ্ছেদে পাগল হয়ে উন্মাদাশ্রমে আমৃত্যু জীবন কাটাল ব্রেজ্কা। কিন্তু যে কয়েকটি মূর্তি ও ছবি গোদিয়ের-এর নাম বহন করছে, সেগুলি চিরকাল কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো ব্রেজ্কারও নাম বহন করবে।

কত শিল্পীর স্ত্রী, স্বামীর পেশাকে ভালবেসে অসংকোচে হয়েছে তার মডেল। আবার কত মহাশিল্পী মডেলকে ভালবেসে, করেছিলেন গৃহিণী। রুবেন্স্-এর দুই স্ত্রী, রেম্ব্রাণ্ট্-এর সাসকিয়া ও হেন্ড্রিখিয়ে তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। অনেক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরাও মডেল হ'য়ে রোজগার করে, তাদের পড়াশুনোর খরচ যুগিয়ে নেয়। বিশেষ করে যারা বিদেশী তাদের পক্ষে এত সহজে অন্য কোন কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অন্য সব পেশায় বিদেশীদের, সরকারী অনুমতি লাগে এবং সে অনুমতি পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বহু শিল্পীর দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে তাদের মনের শিল্পাদর্শকে জাগায় মডেল বিশেষের শরীর ও রূপের ধাঁচ। অনেক সময় পুরোন শিল্পীর নাম-না-লেখা ছবিতে তাঁর প্রিয় মডেলের আদর্শের সাদৃশ্য দেখে ধরে নেওয়া হয়, সে কার হাতের কাজ। আতলিয়েতে কতবার প্রফেসার ও শিক্ষার্থীদের শুনেছি, কোন মডেলকে দেখিয়ে বলতে—রুবেন্স্, এ্যাংগ্র বা ভাস্কর মাইয়ল্-এর টাইপ। মাইয়ল্ যখন তাঁর আদৃতা মডেল 'দীনা'র সন্ধান পান, তখন তাঁকে লেখেন 'মাদ্মায়জেল, শুনলাম তুমি যেন নাকি একটি মাইয়ল-এর ভাস্কর্য। যদি তাই হও, তাহলে আমার আতলিয়েতে এসে ভাস্কর্য রচনায় সাহায্য করলে বিশেষ সুখী হব।' তিনি আমৃত্যু এই দীনাকে সামনে রেখে গড়ে ছিলেন তাঁর সেরা ভাস্কর্যগুলি এবং তার আদলে গড়া একটি বিরাট টরসো'র উপর সারাজীবন কাজ করেও তিনি মনে করেননি যে তার চোখে উদ্ভাসিত দীনার গঠনের সবটা রূপ তিনি দিতে পেরেছিলেন এই মূর্তিতে।

পেশাদারী মডেল ছাড়াও অনেকে শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির কৌতূহল নিয়ে আসেন সখের মডেল হ'তে। শিল্প ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে প্রচুর। একবার সুবিখ্যাত ভাস্কর এপ্ষ্টাইন্ এক প্রৌঢ়ার নগ্না মূর্তির ভাস্কর্য দেখিয়ে আমায় বললেন—জান এ কে?' 'না' বলায় বল্লেন,—'একদিন এই মহিলাটি আমার ষ্টুডিয়োতে উপস্থিত হ'য়ে জানালেন, তিনি রাজকুমারী ব্র্যাগান্জা এবং তাঁর একটি নগ্ন মূর্তি গড়তে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন—'তোমার করা ভাস্কর্য কিনবার সামর্থ আমার বর্তমানে নেই। কিন্তু আমার অনেক দিনের ইচ্ছে যে নিজের চেহারার আদলে তোমার গড়া ভাস্কর্য কেমন হয় দেখব।' ভাবলাম সে পাগল এবং কোন অজুহাতে তাকে বিদায় করলাম কিন্তু আবার বার বার এল সে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সত্যিই, মহিলাটির জন্ম শেষ পর্তুগীজ রাজার পরিবারে। কি জানি কেমন তার প্রতি একটা মায়া হল এবং গড়লাম এই বিগলিতা বিশীর্ণা প্রৌঢ়ার দেহ। মনে করলাম, মস্তিষ্কের বিকৃতিতে সে বোধহয় এখনও মনে করে নিজেকে, সুগঠিতা দেহে সুন্দরী যুবতী এবং আমার করা তার বর্তমান স্বরূপ দেখে হয়ত স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবে। কিন্তু সে নিজেই বল্ল 'মনে ভেব না যে আমার জরাময় দেহের কুরূপ সম্বন্ধে আমি অবচেতন কিন্তু জান, আমি এক সময় ছিলাম সুরূপা সুন্দরী। সে সময় এরকম করে যেচে মডেল হতে চাইলে, তোমরা শিল্পীরা আমায় পাবার জন্যে লাগিয়ে দিতে লড়াই। কিন্তু কেবল যৌবনের জোয়ারকে ধরে কেন হবে সেরা ভাস্কর। তুমি যদি জীবনের অপরাহ্নের ক্ষীণ স্রোতের ছবিতে জাগিয়ে তুলতে পারো, চলে-যাওয়া সে ভরা জোয়ারের স্মৃতি তবেই তোমাকে বলব—কৃতী শিল্পী।' এপ্ষ্টাইন্ আমায়

বললেন, 'ভালো ক'রে দেখ, সত্যিই লোলচর্মের রেখা ধ'রে ফুটে উঠবে তোমার চোখের সামনে উন্নতবক্ষা ক্ষীণকটি যৌবনগর্বিতার ছবি। জিজ্ঞাসা করলাম 'রাজকুমারী ব্যাগান্‌জা এখনও কি আসেন এই মূর্তি দেখতে আপনার ষ্টুডিও তে?' এপ্‌ষ্টাইন্‌ বললেন 'না। এই মূর্তিটা শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি কয়েকতলা বাড়ীর উঁচু ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।'

মডেলদের মধ্যে রাশিয়ান ইয়ানিনার একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রথমতঃ অন্যান্য শ্লাভ্‌ মেয়েদের মতো সে মেদবহুল প্রশস্তবক্ষা ও জঘনা ছিল না। তাদের মত ছিলনা তার পদদ্বয় ভাঁজা মুগুরের মতো। তাদের যেমন চৌকশ মুখে মোটা নাক ও ঠোঁট দেখা যায় ইয়ানিনার মুখ ছিল তার ঠিক বিপরীত। অণ্ডাকৃতি মিহি মুখশ্রীতে ছিল সূক্ষ্ম নাসাপুটে সাজান সোজা নাক, জ্বলজ্বলে ভাসা দুটো কালো কালো চোখ আর ছোট বিম্বোষ্ঠ অধরে মানানো বস্তু। এই সুশ্রী মুখমণ্ডলকে সগর্বে উন্নত রাখত তার মৃণালগ্রীবা। আর তার নীচে যেমন আমাদের চোখ নামত দেখতাম তার নাতি প্রশস্ত পিনোন্নত স্তনশোভিত বক্ষ, কৃশোদর, সুপুষ্ট ও মসৃণ শ্রোণিদেশ এবং তার ভারবহনকারী সুগঠিত ক্রমদীর্ঘ পদযুগল। সে নাকি ছিল কাউন্ট কন্যা। রাশিয়ান বিপ্লবে বিতাড়িত হয়ে এখন হয়েছে প্যারীর শিল্পশালার মডেল। এক সময়ে খ্যাতনামা শিল্পীরা নিযুক্ত হ'ত তার শিল্প-শিক্ষকের কাজে আর এখন সে হয়ে গেছে শিল্প-অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর শিল্প সাধনার উপলক্ষ্য মাত্র। তার স্বভাবজাত আভিজাত্যকে অন্য মডেলরা সমীহ করে তফাতে চলত। যখন সে বুল্‌ভার্‌ মোঁপার্‌নাস্‌ দিয়ে হেঁটে চলত, পাশের ক্যাফেতে বসা শিল্পীরা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানাত। এমন কি প্রফেসার হোর্নরিকও আতলিয়েতে তাকে ভঙ্গির নির্দেশ দিতেন বেশ সম্মান সহকারে। একদিন সে খুব উৎফুল্ল হ'য়ে এল আতলিয়েতে বল্‌ল 'তোমরা আমাকে ফেলিসিতাসিয়ঁ'[2] জানাও কারণ আমি কন্‌জারভেতোয়ার্‌-এর[3] শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছি। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সে কন্‌জারভেতোয়ার-এর খরচ চালিয়েছে মডেলের পারিশ্রমিক দিয়ে। ক্ষুণ্ণ হলাম সবাই যখন সে বল্লে যে তাকে আর মডেল হিসাবে পাবনা। আমাদের যেন একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লে "অবশ্য এত পরিশ্রমের পর যদি অপেরায় গাইবার সুযোগ না পেয়ে আমাকে ক্যাফের গায়িকা হতে হয় তা হলে ফিরে আসব আবার তোমাদের মাঝে" তারপর সে আমাদের সকলকে অনুরোধ করল কোন ক্যাফেতে গিয়ে তার ভবিষ্যত শুভ কামনা করে আমরা তার সঙ্গে কিছু পান করি।

গেলাম তার সঙ্গে মোঁপারনাস্‌ এর একটি অতি সাধারণ কাফেতে। এর একদিকে রেস্তরাঁ সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন ও রাতের আহারে বেশী লোক সমাগম হয়। বাকি অংশে দিবারাত্র লোক আসে খায় কফি বা মদিরা পান্‌ করে খোসগল্প জমাতে। দু' এক কোনে ছবি ও রং বেরঙের বাতি দেওয়া জুয়া খেলার বাক্‌স। তাতে পয়সা ফেলে স্প্রিং-এর ঘায়ে বল গড়িয়ে হাজার বা দশ হাজার নম্বরগুলি ছুঁয়ে, পূর্বে অপারগ লোকেদেওয়া জমা পয়সা তুলবার চেষ্টা করে চলে অনেকে। কেউ বাজী মাত করলেই ক্রিং করে ঘন্টা বেজে যায়। উপস্থিত সকলের একটু টনক্‌ নড়ে বাক্‌স ও খেলোয়াড়ের প্রতি। গারসঁ এসে চাবি খুলে দেয় বাক্‌সর আধারে জমা পয়সার থোক। আবার চলে নতুন উদ্যমে বাজীজেতা খেলোয়াড়ের স্প্রিং ও বলের ঠোকাঠুকি। আমরা সদলবলে হৈচৈ করে কাফেতে বসলাম যেন ইয়ানিনার বাজী জেতার উপলক্ষে।

---

১. বিদায় কাল দেখা হবে। ২. শুভকামনা। ৩. শ্রেষ্ঠ সংগীতশিক্ষালয়।

বসন্তের স্বাদ

অসীম সোম

আমি যেন বসে আছি, তুমি কিছু বলবে
মুখ তুলে চাইবে ,
তারপর কী হবে, কী হবে?
ভুল যদি করে চলি, ভুরু ভেঙে বকবে
ঠোঁট শুধু কাঁপবে
তারপর কী হবে, কী হবে?

বসে থাকা, কথা বলা, চোখ ঠেরে দূরে ঠেলা —
দিবারাত্র এ-কাহিনী পাথেয় সঞ্চয় হ'য়ে
হয়তোবা পড়ে এলো বেলা ঃ

তবুও তো শোনা যায় সমুদ্রের স্বর —
ঢেউ-এর কল্লোল শুনে অনেকেই পাড়ি দিল
অনেকের নোঙরের হ'য়েছে তো সাধ
মাঝে মাঝে মনে হয় আমিও তো পেতে চাই বসন্তের স্বাদ।
আজ তবে এ-প্রতীক্ষার শেষ করে দাও,
আঁচলের আল বেয়ে ফাল্গুন ছড়িয়ে যাক
ভেঙে দাও দীর্ঘ অভিশাপ —
শীতের নির্মোক ছিঁড়ে মুখ ভরে নাও আমার হাতের উত্তাপ।

অনুবেদন

উৎপল চৌধুরী

ঘুরেছি কত না দেশ, কত গঞ্জগ্রাম,
উষর প্রান্তর কত পেরিয়ে এলাম।
নগরের কোলাহলে, জনতার হাটে
শ্যামল বনানী ছায়ে, জনহীন বাটে
বারে বারে গেছি আমি, অতৃপ্ত অন্তরে
উদ্দীপ্ত প্রেরণা নিয়ে খুঁজেছি তোমারে,
প্রতীক্ষার তীর হতে অভীপ্সার দেশে
কেবলই খুঁজেছি ফিরে তোমারই উদ্দেশে।

ব্যর্থ মনে হয় সবই—এই আনাগোনা
তোমার ঠিকানা তবু রয়ে গেল আজও যে অজানা।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমদাসুন্দরী বলে চলেছে,—এত জিলিপী প্যাঁচ ভেতর ভেতর! জানো, তোমাকে জন্মের মত দূর করে দিতে পারি। নদা'কে আমি আবার বিয়ে দেব।

মৃগনয়নী কথা বলে না। বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী বেরিয়ে আসেন। সরলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মৃগনয়নীর পাশে দাঁড়ায়।

—দাঁড়িয়ে করে বলছি, নদাকে আবার বিয়ে না দিই তো আমার নামে গাধা পুষবি। তোকে দূর করে দিয়ে জলস্পর্শ কোরব। পিতিজ্ঞে করে বললুম।

বনবিহারী ঘরে বসে চমকে ওঠে। মেজদা বেরোয় বাইরে।

চ্যালা কাঠ একগাদা শুকোচ্ছিল উঠোনে। প্রমদা রাগে জ্ঞান হারিয়ে একখানা কাঠ তুলে নিয়ে আসে।— বল হারামজাদী কে তোকে আমার ভাইদের তাড়াবার পরামর্শ দিয়েছে। নয়তো আজ তোর হাড়-মাংস আলাদা কোরব।

মেজদা তাড়াতাড়ি এসে প্রমদার হাত থেকে কাঠটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বেশ কড়া করে বলে, — বড্ড বাড় বেড়েছিস। বৌমা আমার লক্ষ্মী। ওর গায়ে হাত দিলে সব যে উড়ে পুড়ে যাবে রে পাগলী!

প্রমদা হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।—ওগো দেখে যাও গো। মেজদা আমায় মারলে! নিজ বউয়ের জন্যে মেরে ফেললে আমায়।

মেজদা আকাশ থেকে পড়ে।— মারলুম কোথায় তোকে ?

হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। আবার মারলুম কোথায়! মার কি আবার গাছ থেকে পড়বে! ভগবান দেখবে ! সব ছারখার হয়ে যাবে। সাতদিন যাবে না, যে আমায় মার খাওয়ালে সে যেন গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরে!

আশে পাশের বাড়ীর মেয়েরা ছুটে আসে। মেজদা বনবিহারী আবার ঘরে ঢোকে। দোর ভেজিয়ে দেয়। শ্বাশুড়ী ঘরে দোর দেয়।

সরলা ভয়ে ভয়ে বলে।—চ' তোর ঘরে গিয়ে খিল দি।

মৃগনয়নী গম্ভীর মুখে বলে,—কেন মেজদি, ভয়ে?

হাঁ তাই, আমার গা কেমন কাঁপছে।

মৃগনয়নীর মুখখানা কালো হয়ে উঠেছে। তবু হাসে, বলে,—আমার একটুও ভয় করছে না। দু' ঘা মারলে তো আর মরে যাব না।

চোয়ালদুটো ওর কঠিন হয়ে আসে, বলে,—তুমি জানো না মেজদি। ওকে আমি ছদিনে টিট্ করে দিতে পারি।

—চুপ্! শুনে ফেলবে!

—শুনিয়েও বলতে পারি।

সরলা ওকে রান্নাঘরের ভেতরে টেনে নেয়। বাইরে উঠোনে প্রমদা চীৎকার করতে থাকে।

শুধু চিৎকার করেই শান্ত হোল না প্রমদা। ওর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে এবার। সেদিন জলস্পর্শ করলে না। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কিছু খেল না। বুড়ী মা দুবার বলতে গেল।

ধমক খেয়ে চলে এল। সরলা একবার ভয়ে ভয়ে গেল।

—ও ঠাকুঝি!

—দূর হও। দূর হও।—প্রমদা মারমুখো। সরলা ভয়ে পালিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত মেজদা আর বনবিহারীকেই যেতে হোল। ছোটভাই গেল পিছন পিছন। ও বাইরের আড্ডায় থাকে বেশী সময়। সাতে পাঁচে যায় না। তবু এ ব্যাপারে যেতে হোল। প্রমদা কি শেষ কালে না খেয়ে মরবে। কিছুতেই কিছু হোল না।

—ও বউকে না তাড়ালে জলগ্রহণ করবে না প্রমদা। কিছুতেই নয়।

তা কি করে হয়! একটা অসম্ভব কথা বললে তো চলে না! মেজদা' রাজী হতে পারে না। প্রমদা যা বলছে তাই। নড়চড় হবে না। না খেয়ে মরা যদি কপালে থাকে। তবে তাই হোক। কিন্তু এমন একটা অন্যায় জিদ্ করা কি ঠিক? মেজদা অনেক বোঝাল। না। কিছুতেই নয়। দিন কেটে গেল। প্রমদা কিছুই খেল না।

সন্ধ্যায় মেজদা' বনবিহারীকে ডেকে নিয়ে বললে,—তুই বরং এক কাজ কর।

বনবিহারী সব কাজ করতে রাজী। নবৌমাকে নিয়ে তবে বনবিহারী কাল চলে যাক। ওকে বাপের বাড়ী রেখে আসুক। এসে ওরা কলকাতায় রওনা হবে। কথাটা মন্দ নয়। তবে সেধে বউকে বাপের বাড়ী পাঠান!

তা' উপায়ই বা কি!

মেয়েটা কি শেষ অব্দি না খেয়ে মরবে?

কলকাতা যাবার টাকাটা না হয় মেজদার কাছে রেখে যাক বনবিহারী!

না। তা হয় না।

বনবিহারী বলে,— আমি ঘুরে এসে টাকা দোব।

তবে তাই হোক।

পরমর্শটা মেজভাইকে দিয়েছিল সরলা। বড় ভাল বুদ্ধি দিয়েছে।

মেজভাই অবশ্য কথাটা ফাঁস করে না। যেন নিজের বুদ্ধিতেই ওর এমন উপায়টা পাওয়া গেছে!

মৃগনয়নীকে রাত্রে বলে বনবিহারী। সব কথা খুলে বলে।

বোনটা বড় জেদী। এক গুঁয়ে। মৃগনয়নী না গেলে হয়তো না খেয়ে মরেই যাবে। রাত্রেও প্রমদা কিছু খায়নি। মাথায় নাকি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। মা বললে। মাথায় জলপটি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আঁচলটা এঁটে বাঁধছে মাথায়।

—কি আর করা যায় বলো!

মৃগনয়নী চুপ করে সব শোনে। একটা নিশ্বাস ফেলে।

—যা ভাল বোঝ, করো।

এ ছাড়া আর কিই বা বলতে পারে মৃগনয়নী। এ ভাবে যাওয়াটা তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি! কি অদ্ভুত কালের প্রভাব! কাল কি হবে, আজ জানা যায় না। গতকাল ভাবতেও পারেনি মৃগনয়নী যে আগামী কাল তার এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। সবই মেনে নিতে হবে। কেন মেনে নিতে হবে, প্রশ্ন করাও চলবে না।

একটু হেসে বলে মৃগনয়নী,—তোমার মা যে এমন করবেন জানতাম না।

গলায় বেদনার আভাস।

বনবিহারী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে।—মা আমার ভালই করছে। দেখো

ভাল হবে।

কি বিশ্বাস! এক স্থির আলোর প্রকাশ যেন!

বনবিহারী অকারণে খুসী হয়। ওটা ওর স্বভাবই!

—দেখো না। তোমার গয়নাটা তো আর এখুনী নিতে হচ্ছে না!

—তা বটে।—স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে মৃগনয়নী। হয়তো ওখানে কর্তাবাবুকে জানিয়ে কিছু টাকা পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

—তবে তো ভালই হবে। গয়নাটা আর যাবে না—বনবিহারী খুব খুসী।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

এমন অকস্মাৎ তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছে না। ও বুঝতে পারছে, মনের সঙ্গে কোথায় যেন এ বাড়ীর প্রতিটি বিন্দু বাঁধা পড়েছে। মনে টান লাগছে ছেড়ে যেতে। টন্ টন্ করছে। আবার কবে এ বাড়ীতে আসবে, কে জানে? মেজদিকে ছেড়ে যেতে হবে। ওকে ছেড়ে থাকতে হবে। আর বুড়ী! নীরব অসহায় বুড়ী শ্বাশুড়ীকে যে সে এ কদিনেই এতখানি ভালবেসেছে, ভাবতেও পারেনি সে। ছোট চৌকো জানালাটার কাছে যায়। কলা গাছটা এবার বর্ষায় পচে নষ্ট হয়ে গেছে। চৌকো এক ফালি আকাশ।

গাঢ় নীলে ভরা। চোখদুটোয় আকাশের নীল ছায়া নামে। বড় বড় চোখদুটো ওর দু' আঙুলে একবার ডলে নিয়ে মুখ ফেরায় মৃগনয়নী।

—কাল কখন যেতে হবে।

বনবিহারী বিড়ি ধরিয়েছে।— এই দুপুরের আগে। খাওয়া দাওয়া সেরেই গরুর গাড়ীতে উঠব।

আবার জানালার দিকে তাকায় মৃগনয়নী। ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোথায় কি যেন একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুর ঘর কি হারিয়ে যাবে! স্বামী কি আবার বিয়ে করবে? আর কি এখানে আসা হবে না? মনটা শূণ্য হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। মুখ ফিরিয়ে দেখে। বনবিহারী শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ও আলোটা বাড়িয়ে তোরঙ্গটা খোলে। কাপড় চোপড় আজ গুছিয়ে রাখলেই ভাল। কাল সময় পাবে কিনা কে জানে! আজই সব গুছিয়ে রাখবে।

রাত কেটে যায়। পরদিন সকালে বাড়ীটা যেন থম্‌থম্ করছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মৃগনয়নীও হাসতে পারে না আর। গম্ভীর হয়ে যায়। সরলার মুখটা একরাত্তিরেই যেন শুকিয়ে গেছে। চোখদুটো নিদারুণ অসহায় ভাব। কোন কথা বলে না সরলা। মুখ নীচু করে কাজ করে যায়। খাওয়া শেষ হয়। মৃগনয়নীও খেয়ে নেয়। গলা দিয়ে ভাত আর নামে না। দুটি খানি খেতে হয় তবু। যাবার সময় হয়ে এসেছে। বাইরে গরুর গাড়ীতে মাল তুলছে গাড়োয়ান। বনবিহারী মাল পত্র তুলতে ব্যস্ত। এবারে তাহলে প্রস্তুত হতে হয়। বনবিহারী তাড়া দেয় একবার। সরলা ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছে। কেন কে জানে? মৃগনয়নী মাথার ওপর ঘোমটা তুলে সরলার ঘরের দিকে এগোয়।

ঘর ঠেলে। বন্ধ।

কি হোল? ও মেজদি! মেজদি!

কিছুক্ষণ ডাকবার পর দোর খোলে সরলা। চোখদুটো ফুলো ফুলো রাঙা। অনেক কেঁদেছে। অনেকক্ষণ। মৃগনয়নী প্রণাম করে। মুখখানি থম্‌থমে মেঘলা। সরলা কথা বলতে পারে না। সর্বশরীর ওর কাঁপছে। নিজেকে সামলে নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে শ্বাশুড়ীর ঘরে যায় মৃগনয়নী।

শ্বাশুড়ী গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন দাওয়ার ওপর। মুখ আমসীর মত বিশুষ্ক।

মৃগনয়নী প্রণাম করে। বুড়ী দুহাত মৃগনয়নীর পিঠের ওপর রাখে।

ফিস্ ফিস্ করে বলে,—আমাকে আর দেখতে পাবে না মা। আমি আর বাঁচব না। বুড়ীর অসহায় জোলো চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে সামলায় মৃগনয়নী ওখান থেকে সরে আসে। উঠোনে মেজভাসুরকে প্রণাম করে।। ছোট দেওর ওকে প্রণাম করে।

আস্তে আস্তে এগোয় বাড়ীর বাইরে গরুর গাড়ীর দিকে। পিছন ফিরে ঘরগুলোর দিকে তাকায় একবার। তাকায় রান্নাঘরের দিকে।

বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে যেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাইরে গিয়ে গরুর গাড়ীতে উঠে বসে।

দুর্গা। দুর্গা। গরুর গাড়ী চলতে সুরু করেছে। ফুল গাছটা পেরিয়ে যায়। তারপর বেতঝোপ। মঙ্গলার মায়ের ঘর পেরিয়ে গেল। পেরিয়ে গেল ওদের নিত্য স্নান করবার গাঁ-ধোবার পুকুর। মৃগনয়নী চোখে দেখতে পাচ্ছে না আর। সব ঝাপসা। বনবিহারী শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকায়। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মৃগনয়নী। আশ্চর্য!

বনবিহারী পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরায়।

আট

ভাগ্যি মানুষ ভুলে যেতে পারে। জীবনে বহুবার মৃগনয়নীকে বলতে শুনেছি।—ভাগ্যি ভুলে যাওয়া যায়। ভাগ্যি সব মনে থাকে না। নইলে মানুষ বড় বড় আঘাতের স্মৃতিগুলোর ব্যথাবেদনায় মরে যেত।

কথাটা যে কত বড় সত্য নিজেও টের পেয়েছি। মৃগনয়নীর কাছে সত্য উদ্ভাষিত হয়েছে অভিজ্ঞতার আলোয়?

মানুষ যদি কিছুই ভুলে না যেত, জীবনের বড় বড় বেদনা। কঠোর অভাবের কথা সবসময় তাকে জ্বালিয়ে দিত। কালের প্রলেপ পড়ে স্মৃতির ওপর। ভুল হয়ে যায়। অতীত বিলীয়মান হয়ে যায়। তা না হলে সংসারটা দুদিনে নরক হয়ে উঠত।

কাল তার হাতে সব বেদনার চিহ্ন ধুয়ে মুছে দেয়। আবার স্নিগ্ধ সরস করে তোলে মানুষকে। আশ্চর্য তাঁর কঠোর করুণা। যেমন কঠিন। তেমনি করুণ। সংসারের সব বিধানের ভেতর এমন শুভ বিধান বোধহয় দুটিনেই।

না জেনে কত আক্ষেপ করি! কেন ভুলে গেলাম। জীবনের সবচেয়ে যে প্রিয়। তাকে কেন ভুলে গেলাম। জীবনে অনেক মুহূর্তে যাদের কাছে অনেক পেলাম, দিলামও অনেক তাদের কেন ভুলে গেলাম! কেন ভুলে যেতে হয় অনেক ভালবাসা স্নেহের দিনগুলো!

এ আক্ষেপ—আক্ষেপই! ভুলে না যেতে পারার চেয়ে যন্ত্রণা সংসারে কল্পনা করাও যায় না। মৃগনয়নীর জীবনের বহুদিনের কাহিনী এ কথা সত্য করে দিয়ে গেছে।

ভুলে যেতেই হবেই। মৃগনয়নীও ভুলে গেল ধীরে ধীরে ওর শ্বশুর ঘরের অনেক স্মৃতি। বাপের বাড়ী পৌঁছে প্রথম প্রথম সরলার ভ্রূর কালো মুখখানা, সজল ম্লান চোখদুটো কিছুতেই ভুলতে পারত না ও। শ্বাশুড়ীর শেষ কটি কথা ওর চোখদুটোকে ভাসিয়ে দিত জলে। কিন্তু কদিন? মাত্র কয়েকটা দিনেই ভুলতে সুরু করল মৃগনয়নী।

দিনদুই মাত্র থাকবে বনবিহারী। কথাটা কর্তাবাবুকে বলতে হয়। কর্তাবাবু বছর খানেকের ভেতরেই যেন অনেকটা স্থবির হয়ে গেছেন। কানের একটু গোলমাল হয়েছে। জোরে না বললে শুনতে পান না।

নায়েব মশাইকেই কথাটা চেঁচিয়ে বলতে হয়।—জামাই বলছে কাল চলে যাবে।

—কাল? কর্তাবাবু ঘাড় নাড়েন।—না, তাকি হয়। কতদিন পর এলো। দিনকতক থেকে যাও বাবা!

কর্তাবাবুর মুখের ওপর কথা বলা চলে না—এটা যেন চিরকালের নিয়ম।

বনবিহারীও কথা বলে না।

মনে মনে একটু খুসীই হয়। যেকটা দিন থাকা যায়। এর পর আর কতদিন মৃগনয়নীর সঙ্গে সাক্ষাত হবে না— কে জানে।

দিন সাতেক থাকাই ঠিক করে ফেলে বনবিহারী।

রাত্তিরের আগে মৃগনয়নীর মুখ দেখবার উপায়ও নেই। বাইরের ঘরগুলোতেই শুয়ে বসে কাটাতে হয়। বসে বসে বিঁড়ি টানতে হয়। বিঁড়ির পয়সা নায়েবমশাইয়ের কাছ থেকে নেয় হৃদয়। দরকার হলে শুধু হৃদয়কে বলা, এক বাণ্ডিল নিয়ে এসোত' হে!

রাত্তিরে শুতে যাবার জন্যে ডাকতে আসে হৃদয়। তাও অনেক রাত্রে। বড় বাড়ীর খাওয়া চুকতে চুকতে রাত দেড়টা। প্রায় দুটোর সময় শুতে যাওয়া। এই নিয়ম। রাত নটা দশটা তো সন্ধ্যে। বিকেলের জলখাবারের ক্ষীর চিঁড়ে তখনও পেটে পাক খেতে থাকে। কাজেই খেতে যেতে হয় বারোটায়। কখনও সাড়ে বারোটায়।

মৃগনয়নী মাকে একবার বলবে ভেবেছিল,—রোগা মানুষ। অত রাতে খেলে সইবে না! বলতে কিন্তু পারলনা। কিছুতেই পারল না বলতে। সেই শুতে রাত দুটো। ভোরে উঠতে হয় আবার। রোদ্দুর ওঠবার পরও যদি ঘরের দোর বন্ধ থাকে, তবে আর রক্ষে নেই। কর্তামা খুড়ীমা ওরা তাকাবে বিরক্ত হয়ে। আর সমবয়েসী বৌ বোনদের মুচ্‌কী হাসির জ্বালায় টেকা যাবে না। দেখবে আর হাসবে।

মৃগনয়নীকে ভোরে উঠে বেরোতেই হয়। বনবিহারী দোর খোলা ঘরে একা একা কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে আরও। অত ভোরে কিছুতেই উঠতে পারে না।

তাতেও বৌঠান বলে বসে মৃগনয়নীকে—আহা, বেচারীকে বোধহয় একদম ঘুমুতে দাও না

—ধ্যেৎ! বড্ড বাজে বলো! — মৃগনয়নী চটে যায়।—যার যা অভ্যেস। অত রাত্তে শুয়ে ভোরে উঠতে ও পারে না।

বৌঠান তবু হেসে বলে যাবে,—কর্তামাকে বলি তবে তোমাদের সন্ধে-সন্ধি শোয়ার ব্যবস্থা করতে। বলেই চলে যায়। মৃগনয়নী বিরক্ত হয়। জানে বৌঠান বলবে না। তবু বিরক্ত হয়।

পুঁটি আজ মাস তিনেক শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। তারা নিতে আসেনি এখনও। তরঙ্গিনী আসেনি। একবার এসে দিন সাতেক ছিল। তাতেই নাকি অস্থির।

—না গেলে ওরা রাগ করবে কর্তামা।

কর্তামা হেসে বলেছিলেন—পাগলী! এর ভেতর শ্বশুর ঘরের ওপর এত টান!

কিছুতেই থাকবে না তরঙ্গিনী। পুঁটিকে নাকি বলেছেও,—যাই বলিস ভাই, থাকতে পারি না ওকে ছেড়ে। মাথা-টাথা সব গরম হয়ে যায়। পুঁটি অবাক। বৌঠানও টিপ্পনী কাটে। তরঙ্গিনীর ভালই লাগে।

বিয়ের পর রূপ যেন ওর ফেটে পড়ছে। আরও গতরে ভারী হয়েছে। রঙ হয়েছে যেন পাকা সিঁদুরে আমের মত। চোখে যেন দুটো কালো ভ্রমর ভাসছে! উড়ি-উড়ি। পালাই পালাই ভাব। ফুলের খোঁজে উধাও। ফুলের ওপরে ধাঁর। নইলে অস্থির।

—থাকতে-টাকতে পারব না বাপু!

চলে যায় তরঙ্গিণী। ওর বর এসে নিয়ে যায় ওকে। সুশীলকে বৌঠানের সামনেই নাকি ধমকে উঠেছিল।—না এলেই পারতে! জন্মভোর থাকতুম এখানে! সুশীল মাথা চুলকেছিল। বৌঠান হেসে লুটোপুটি। পুঁটি দেখে স্তম্ভিত। চক্‌চক্‌ করে জল খেয়ে ফেলে এক গেলাস।

ভাবগতিক বুঝতে পেরেছিল কর্তামা ওরাও। কেউ আর অমত করলে না। পরের দিনই সুশীলের সঙ্গে তরঙ্গিণী চলে গেল। আর আসেনি।

পুঁটি মাস তিনেক এসেছে। একা একাই থাকে বেশীর ভাগ সময়। বৌঠান ওরাও কাছে ঘেঁষে না বেশী। ওর কাছ ঘেঁষে আরাম নেই। মজা নেই। হোত তরঙ্গিনী? হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলত।

মৃগনয়নী এসে পুঁটিকে দেখে খুব খুসী,—খুব কিন্তু রোগা হয়ে গেছিস পুঁটিদি! পুঁটি ভয়ে ভয়ে তাকায় ওর দিকে।

—ওকিরে। অমন করে তাকাচ্ছিস কেন?

ও কথার জবাব না দিয়ে পুঁটি বলে,—তোকে বুঝি এ্যাদ্দিন ছাড়ে নি?

—না, তা নয়। আমিই আসিনি। আসবার লোকও ত চাই! দূর ত' কম নয়!

—তা বটে! ওখানকার সবাইকে কেমন লাগলরে?

—ভাল। খুব ভাল লেগেছে। আমার জা'র মত মানুষ হয় না!

—আর আমার জা'। ওরে বাবা! আমার বিয়ের পর থেকেই বলে বাড়াঘর দোর ভাগ করো। আর আমার দিকে এমন চোখ বড় বড় তাকাত তাই!

পুঁটির ভয় দেখে মৃগনয়নী হেসে ফেলে—অত যদি সখ তবে। ভাগ করতে বললেই পারতিস।

—কি হবে বলে!—পুঁটির স্বরটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

—কেন? বলবি তোর বরকে!

—বরকে? ম্লান হাসে পুঁটি।

মৃগনয়নীর একটু কেমন কেমন লাগে ওর ভাব-সাব। চটকরে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কানের কাছে মুখটা এনে পুঁটি বলে,—হ্যাঁরে। তুই নাকি পোয়াতি? বৌঠান বলছিল।

চোখদুটো নামায় মৃগনয়নী। ঘাড় নাড়ে।

পুঁটির মুখটা যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বলে তেমনি ফিস্‌ ফিস্‌ করে,— ক 'মাস'?

—চার। দিদির খবর কিরে? ও নাকি বরকে ছেড়ে একদম্‌ থাকতে পারে না?

—না। তুই?

—কি করে বুঝব বল?

—তবু কি মনে হয় তোর?

মৃগনয়নী একটু চুপ করে থেকে বলে,—মনে হয়? মনে হয় রোগা মানুষ। ওখান থেকে এ মাসেই কলকাতা যাবে। অসুখ বিসুখ কিছু হয়ে পড়ে যদি। ভয় হয়। বলতে বলতে সত্যিই

মৃগনয়নীর গলাটা একটু নরম হয়ে আসে। পুঁটি কথা বলে না। নিজের মনেই কি যেন ভাবে। মৃগনয়নী পাদুখানা মুড়ে ওর পাশে ভাল করে বসে। কতদিন পরে পুঁটিদির সঙ্গে নিরালায় আলাপ!

—মানুষটা বড় দুর্বল। বাড়াতেও ওকে কেউ মানে না। বাইরেই থাকে বেশী।

বনবিহারীর গালভাঙা মুখের ওপর পিঙ্গল চোখদুটি ওর মনের ওপর পরিষ্কার ভেসে ওঠে।

—আর এমন সোজা মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটু যদি সংসারী বুদ্ধি থাকে।

—তাই নাকি?—পুঁটিও সরে আসে ওর আরও কাছে।

—হ্যাঁ, এখন ত' সবকিছু আমাকেই বলে করে করাতে হয়!

—তোকে বুঝি খুব মানে?

মৃগনয়নী একটু রাঙা হয়ে ওঠে,—ঠিক তা নয়। মানে নিজে ত' ওসব বোঝে না। যদি বলি ছেলেপুলে হলে কি করে চলবে? বলবে,—মা জানে।

—মা কে? তোর শ্বাশুড়ী?

—না। ও আবার মা কালীর ভয়ানক ভক্ত কিনা?

—সত্যি? বড় সুন্দর মানুষটি ত'?

স্বামীর প্রশংসায় মৃগনয়নীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বলে,—মনটা একেবারে সাদা। দোষের ভেতর একটুও ভাবনা চিন্তা করবে না।

পুঁটির কিন্তু খুব ভাল লাগে বনবিহারীর কথা শুনতে। বলে,—ভাবনা চিন্তা বেশী নাই বা করল?

—তা কখনও হয়? সংসার করতে গেলে সবই ভাবতে হয়।

—তা বটে।—পুঁটি সায় দেয় অগত্যা।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে। কলকাতায় গিয়ে বনবিহারী যদি ভাল একটি চাকরী পায়। তবেই মঙ্গল। কলকাতায় বাসা করবে। ছেলে কোলে নিয়ে ও যাবে নোতুন বাসায়। নোতুন বাসা! কথাটার ভেতরও যেন এক রোমাঞ্চকর নতুন স্বাদ আছে। কি যে আস্বাদ মুখে বলে বোঝাতে পারে না ও।

পুঁটির দিকে তাকিয়ে আপনমনেই একটু হেসে ফেলে। চাপা খুসী উপ্‌ছে পড়ে ওর চোখে মুখে। হঠাৎ পুঁটির মুখটার দিকে নজর পড়ে। পাংশু মুখে বসে আছে ও।

—পুঁটিদি!

পুঁটি তাকায়।

—তোর বর কবে আসবে রে?

পুঁটি ভীতু চোখ দুটো তুলে তাকায়।—জানি না ত'।

—সে কিরে। কিছু বলেনি।

—না।

—কেন? কবে আসবে, কবে নেবে। কিছু বলেনি?

পুঁটি চোখদুটো নামায়।

ঝগড়া হয়েছে বুঝি?—মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে।

—ঝগড়া!—পুঁটি চোখ তোলে,—কই না ত'?

—তবে? আসবার আগে কিছু কথা হোল ত?

—কথা হয়েছে।

—বল না। কি কথা?

পুঁটি চুপ করে থাকে একটু সময়। কি যেন ভাবে অনামনস্ক হয়ে।

—কি ভাবচিস? আমার কথা সব শুনে নিজের কথা কিছু বলবি না।

পুঁটির মুখটা ম্লান হয়ে যায়। মৃগনয়নী হাতখানা নিজের রোগা ঠাণ্ডা হাত দুটোর ভেতর নেয়। একটু চাপ দেয় সস্নেহে। বলে,—আমার যে কিছু বলবার নেই ভাই।

মৃগনয়নী কৃত্রিম রাগে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

বলে,—বললেই ওমনি বিশ্বাস করব।

পুঁটি মুখখানি নীচু করে বসে থাকে।

আস্তে আস্তে বলে,—ও ত' কথা খুব কম বলে।

—তুইও বলতিস না?

—আমার কথা বলতে ভয় করত।

—কেন?

মৃগনয়নী কি আর বলবে! বেদনায় ওরও মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে।

বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে গালের ওপর।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে বলে,—সেকি পুঁটিদি। কেন?

ও যা চাইত' আমার কাছ থেকে পেত না। ওকে দেখলেই রাত্তিরে আমি কাপড় মুড়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকতুম।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

বড্ড ভয় করত ভাই, বিশ্বাস কর।

পুঁটি চোখদুটো তোলে,—কি করে বলব বল? আমাকে বিয়ে করে ও সুখী হয়নি।

শেষ অব্দি রাত্তিরে—

বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে পুঁটির পাণ্ডুর গালের ওপর,—শেষ অব্দি রাত্তিরে আমায় মারত। পিঠে লাথি মেরে ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে যেত অনেক রাত্তিরে। তবু আমি—।

গলাটা বন্ধ হয়ে আসে পুঁটির।

এক পশলা কাহিনী শুনছে মৃগনয়নী। মৃগনয়নীর চোখদুটোও জলে ভরে ওঠে। পুঁটির চোখের জল অনেক পড়ে। অনেক। আঁচলে চোখ মোছে। আবার গালদুটো ভিজে যায়। অনেক সময় কেটে যায়। একবার ডাকে মৃগনয়নী,—পুঁটিদি! পুঁটি চোখ তুলতে পারে না।

এখন তুই কি করবি পুঁটিদি?

পুঁটি সময় নেয়। আরও সময় নেয়।

মৃগনয়নীও ওকে সময় দেয়।

অনেক পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা গলে পড়ছে আজ। এতদিন কাউকে এ কথা বলতে পারেনি পুঁটি। জমাট আক্ষেপের ভারে নুয়ে পড়ে সময় কাটাচ্ছিল। আজ বুকটা যেন অনেক ফাঁকা লাগছে। মৃগনয়নী ওকে বাঁচাল। মৃগনয়নীর হাতখানা আবার ধরে ওঠে। হাতদুখানি ওর বরফের মত ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে একটু একটু কাঁপছে। মৃগনয়নী নিজের হাতের ভেতর ওর হাত দুখানা নিয়ে চেপে ধরে।

(ক্রমশঃ)

প্রবাস-পুরাণ

প্রবাসপুরাণ অতীব বিধুর। যিনি অপ্রবাসী তিনি এ পুরাণের খোঁজ রাখেন না। যিনি প্রবাসী তিনি কখনো এ পুরাণের খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করেন কিনা সন্দেহ। সকলের অবহেলায়, অনাদরে ও অজ্ঞাতে প্রবাসীর চোখের সামনে যেসকল সমস্যা প্রচণ্ডভাবে ক্রমবর্ধমান, সেইত আমাদের প্রবাস-পুরাণ!

"আমি আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী"—কবিচিত্তের এ-চিরন্তন হাহাকার সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে খুব বেশি সাড়া দেয়না। মানুষ যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ঠাঁই তার কাছে স্বর্গসমান। স্বর্গ হতে বিদায় দেবতারাই নিতে কাতর হন; তা আর মানুষের কথা কি ছার। কাজেই ঘরের মানুষ বিদেশ-বিভূঁইয়ে সহসা পাড়ি জমাতে একেই তেমন বেশি উৎসাহ পায়না, তাতে আবার সে-পাড়ি অদূরভবিষ্যতে চিরস্থায়ী নির্বাসনে পরিণত হলে স্বতই তার অন্তর ডুকরে কেঁদে ওঠে—আমি প্রবাসী।

এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম কিসে না আছে! আসলে স্বভাবিকভাবে সাধারণত যা ঘটে সেইত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরবাসী নয়, প্রবাসী। প্রবাসে মানুষ আসে নানা কারণে। সহজে কেহ নিজের জন্ম-স্থান ছেড়ে প্রবাসী হতে চায়না। প্রধানত পেটের তাগাদায় মানুষকে জন্মস্থানের সীমানা পেরিয়ে জীবিকার অন্বেষণে ছুটতে হয়। স্থিতীয়ত মানুষের অন্তরে যে ঘুমন্ত-যাযাবর বাস করে সময় সময় কোন-না-কোন রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ভাগ্যপরিবর্তনের দুর্বার তাড়নায় সেই যাযাবর ঘুম ভেঙে নূতন দেশের হাতছানি লক্ষ্য করে অন্ধকারে পরবাসের পথে ছুটে চলে। কিন্তু ভাগ্যপরিবর্তন অন্তে কেহ কেহ স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন যেমন পছন্দ করেন, তেমনি কেহ কেহ পরবাসে স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হয়ে প্রবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি ক'রে থাকেন।

ইংরেজ আমলের প্রায় দুশ বছর ধরে অনেক বাঙালী ঘর ছেড়ে প্রবাসী হয়েছেন। কারো কারো প্রবাসে কয়েক পুরুষ কেটে গেছে। কারো বা অল্প কিছুকাল প্রবাসজীবনের এইত সবে সুরু। কিন্তু প্রবাসী বলতে তাঁদেরই ধরা যায়, যাঁরা আর দেশে ফিরতে কখনো তেমন ইচ্ছুক নন। এমন বাঙালীর সংখ্যা বাঙলার বাইরে সারা ভারতে কম নয়। সংখ্যায় কমবেশিতে সমস্যার ইতরবিশেষ না ধরেই প্রবাসী বাঙালীর সমস্যা বহুবিধ।

সমস্যাগুলির কথায় পরে আসা যাবে। আপাতত প্রবাসীর গুণগত হিসাবের দাড়িপাল্লায় একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলে যেসকল বাঙালী জন্মভূমির সীমানা ডিঙিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই পদার্থের ওজনটা পরিমাণে একটু ভারিই ছিল। তারই কল্যাণে তাঁরা একরকম সর্বত্র সর্বেসর্বার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন প্রায় সর্বভারতীয় সর্বক্ষেত্রেই। ইংরেজের নতুন আইন প্রয়োগে এবং সে-আইনের খুটিনাটি বিশ্লেষণে বাঙলার বাইরে প্রবাসী

বাঙালীর সমকক্ষ খুঁজে মেলাই ছিল ভার। ইংরেজী শিক্ষার নতুন নতুন অবদানে সারা ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীরা প্রথম থেকে যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন তার ঐতিহ্যবাহী প্রবাসী বাঙালীরাও কোথাও কারো অপেক্ষা পিছিয়ে ছিলেননা। আর জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনায় প্রবাসী বাঙালীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। সর্বোপরি কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং চরিত্রসম্পদে ও নৈতিক দৃঢ়তায় প্রবাসী বাঙালী জীবনের নানাক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সে ছিল একদিন! ইতিহাসের যুগবিবর্তনের বন্ধুর গতিপথে বর্তমানে সেদিনের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট হতে বসেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা।

প্রবাসী বাঙালীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তাই বলে চির-অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু যে অশেষ সমস্যার সম্মুখীন একালের প্রবাসীরা তার সঙ্গে সমাক পরিচিতি এবং তার সমাধান ব্যতিরেকে ঐ ঐতিহাসিক ভূমিকায় তার অংশগ্রহণ অবাস্তব স্বপ্ন বইত নয়!

প্রবাসীর বহুবিধ সমস্যাকে প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলা চলে। যেমন; সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আবাসিক ও অর্থনৈতিক। এর মধ্যে যদিও শেষোক্ত সমস্যাটি প্রধানতম তবুও বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বিচারে অন্যান্য সমস্যাগুলির স্বীকৃতি সর্বাধিক।

বাঙালীর সামাজিক চরিত্রে যেমন প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি তেমনটা অন্যত্র সচরাচর দুর্লভ। নমুনাস্বরূপ—স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ নিয়ে যতটা তার মাতামাতি ততোধিক তার নারীসমাজের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শৃঙ্খলের বন্ধন উপহারের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির উল্লেখ করা যায়। আর সামাজিক বাদবিচারে বাইরে তাঁরা যতই বক্তৃতায় উদার হননা কেন, বাস্তবক্ষেত্রে 'মনুই তাঁদের আমরণ ত্রাণকর্তা। প্রবাসী বাঙালী 'কমুলিকে ছাড়লেও কমুলি তাঁকে সহজে ছাড়েনা।' তাই সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতার পঞ্চভূত প্রবাসীর সমাজজীবনে অকস্মাৎ একদিন পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যাপারে দশপাটি দাঁত মেলে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। যেখানে মেলামেশায়, আহার-বিহারে, অবাধমিলনে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকেনা, সেখানে হঠাৎ একসময় পুত্রকন্যার পিতা-মাতা আচম্বিতে আবিষ্কার করে বসেন যে, তাঁদেরও জনে-জনের কোন-না-কোন মহামুনির রক্তসম্ভূত কৌলীন্যে সমাজে ছোটবড় বংশগৌরবের অধিকার আছে! তখন সমপর্যায়ের ও সমকুল তথা সমমেলের ধাক্কায় পিতামাতাকে পুত্রকন্যার বিবাহের একটি যোগ্য গতির ব্যবস্থা করতে প্রায়ই বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। প্রবাসে কেহত আর কুল মেল খুঁজে-পেতে এসে ডেরা পেতে বসেননা। সুতরাং কুল বাঁচাবার জন্যে প্রবাসীর প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়।

এ ছাড়া সামাজিক সমস্যার অন্য একটা দিক আছে। কোন কোন প্রবাসী পরিবারে স্বাভাবিক নিয়মেই তথাকার মূল-বাসিন্দাদের আনাগোনা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কেবল যে উভয় সমাজের ভালমন্দ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে তাই নয়; ক্ষেত্রবিশেষে নতুন সংমিশ্রণের উদ্ভবও হয়। এমন অবস্থায় প্রবাসী সমাজে সমস্যার রূপান্তর ঘটে।

প্রবাসী বাঙালীর সাংস্কৃতিক সমস্যাই বড় সুকঠিন। বাঙালীর নিজস্ব একটি জাতীয় সংস্কৃতি গভীরতম প্রভাব নিয়ে বাঙালীর চরিত্রে বিদ্যমান। সেই কারণে জাতীয় চরিত্রের ভালমন্দ বাঙালী যেখানেই যায়, সেখানেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। অনেক অপবাদ আজকাল বাঙালীর প্রতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বাঙালী প্রবাসী হয়েও তাঁর সম্বল কালীবাড়ী, দুর্গাপূজা —এবং ঐ দুটিকেই কেন্দ্র করে ঘুটঘণ্ডলী পাকাতে ও কোন্দল করতে তাঁরা আসক্ত বলে শোনা যায়। উপরি 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' তাঁর অপবাদের সূত্র জোগায়। যেদেশে বাঙালী প্রবাসী সেখানকার সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা দূরে থাক,

প্রবাসী বাঙালীরা স্থানীয় জনসাধারণকে প্রায়শ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, এ অভিযোগও নতুন নয়। তা ছাড়া, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা প্রবাসীর মধ্যে ক'জনই-বা করে থাকেন।

উপরোক্ত দ্বিবিধ সাংস্কৃতিক সমস্যার সঙ্গে প্রবাসীর সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার সরস্যাও উল্লেখযোগ্য। সত্যি বটে, উত্তরভারতের কোন কোন নগরীতে প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকাদের মাতৃভাষা শিক্ষার যৎসামান্য ব্যবস্থা এতদিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐ যৎসামান্য ব্যবস্থা যেমন কয়েকটি জায়গায় মাত্র সীমাবদ্ধ তেমনি বহু জায়গাতে প্রবাসী শিশুদের বিদেশে কাটিয়ে একদা ছেড়ে আসা বাসভূমিতে আবার যে ফিরে গিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নেবেন, তেমন যোগ্যতাও তাঁদের মধ্যে সুলভ নয়। এবং অনেকেরই আদিম আবাস ইতিমধ্যে চির-অবলুপ্ত হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প এক-রকম উপহাস উৎপাদনেরই সহায়ক হয়।

যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে বাঙালী একদিন প্রবাসী হতে ইতস্তত করেননি, ইতিহাসের রূঢ় পরিহাসে আজো তাঁর সে সমস্যা অনেকটা যেমন তেমনই রয়ে গেছে। বরং প্রবাসে যাঁরা কয়েক পুরুষ প্রবাসী তাঁদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজ আগেকার চেয়ে ভয়াবহ। কোন কোন প্রবাসী পরিবারের দুই তিন পুরুষের ভাগ্যবিবর্তন ও বিপর্যয় যেমন নাটকীয় তেমনি গবেষণার বিষয়। এমন পরিবারও প্রবাসে দুর্লভ নয়, যাঁদের প্রথম পুরুষ একমাত্র বিধাতাপুরুষের আদিম ও অকৃত্রিম উপহার সম্বল করে প্রবাসে এসে অর্থসম্পদে সৌভাগ্যশালী, সুখী পরিবার হিসাবে কিছুদিনের মধ্যেই নাম কিনে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী পুরুষ অতিমাত্রায় অভ্যাধুনিক ও কৃত্রিম পরিবেশ ও ভোগবিলাসে আসক্ত হওয়ায় ভাগ্যের নির্মম রথচক্রতলে নিষ্পিষ্ট হয়ে বর্তমানে নিঃসম্বল ভিখিরীতে পরিণত হতে চলেছেন।

আদিতে প্রবাসী বাঙালীর অর্থনীতিক বনিয়াদ মূলত তৈরি হয়েছিল চাকরির ভিত্তিতে। দুই শতাব্দী আগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন ইংরেজরাজের ভারত শাসন কার্যের নানান্ শাখা-প্রশাখায় বাঙালী চাকুরিজীবীরূপে কেবল যে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাই নয়; ক্রমঅর্জিত সেই সুনামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তথা প্রবাসী বাঙালীর তথাকথিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠাই ক্রমাগত কঠোর প্রয়াস ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়না। শ্রেষ্ঠত্ব বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করাও মোটেই সহজ নয়। এই কথাগুলি আজিও যে অভ্রান্ত, বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালীর চাকুরি-আশ্রয়ী অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিপর্যয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অদূরদর্শিতা এবং অতিকঠোর-শ্রমভীতি তৎসহ জাতীয় চরিত্রগত ব্যবসা-বিমুখতার কারণে প্রবাসী বাঙালী এ পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতেই সন্তুষ্ট হয়ে এসেছেন। অধ্যাপনা; সেও চাকুরিহিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এরই ব্যতিক্রম ঘটেছিল ওকালতি এবং ডাক্তারিতে। তথাপি শেষোক্ত ক্ষেত্রদুটিতেও বর্তমানে প্রবাসী বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বীর একেই অভাব নেই, তদুপরি ক'জন প্রবাসী তরুণ-ই-বা আজকাল আর ওকালতি ডাক্তারির ক্ষেত্রে দশের একজন হবার কঠোর সাধনায় লিপ্ত আছেন!

মোটের উপর প্রবাসী বাঙালীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারেই ঘাতসহ নয়। যে কোন মুহূর্তে সামান্য আঘাতে সে বনিয়াদ ভঙ্গুর।

প্রবাসজীবনের এক পিঠ শেষ হল। কিন্তু অপর পিঠ না দেখলে এ-দেখা অসম্পূর্ণই

বাঙালীর সমকক্ষ খুঁজে মেলাই ছিল ভার। ইংরেজী শিক্ষার নতুন নতুন অবদানে সারা ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীরা প্রথম থেকে যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন তার ঐতিহ্যবাহী প্রবাসী বাঙালীরাও কোথাও কারো অপেক্ষা পিছিয়ে ছিলেননা। আর জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনায় প্রবাসী বাঙালীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। সর্বোপরি কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং চরিত্রসম্পদে ও নৈতিক দৃঢ়তায় প্রবাসী বাঙালী জীবনের নানাক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সে ছিল একদিন! ইতিহাসের যুগবিবর্তনের বন্ধুর গতিপথে বর্তমানে সেদিনের চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট হতে বসেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা।

প্রবাসী বাঙালীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তাই বলে চির-অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু যে অশেষ সমস্যার সম্মুখীন একালের প্রবাসীরা তার সঙ্গে সমাক পরিচিতি এবং তার সমাধান ব্যতিরেকে ঐ ঐতিহাসিক ভূমিকায় তার অংশগ্রহণ অবাস্তব স্বপ্ন বইত নয়!

প্রবাসীর বহুবিধ সমস্যাকে প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলা চলে। যেমন; সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আবাসিক ও অর্থনৈতিক। এর মধ্যে যদিও শেষোক্ত সমস্যাটি প্রধানতম তবুও বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বিচারে অন্যান্য সমস্যাগুলির স্বীকৃতি সর্বাধিক।

বাঙালীর সামাজিক চরিত্রে যেমন প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি তেমনটা অন্যত্র সচরাচর দুর্লভ। নমুনাস্বরূপ—স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ নিয়ে যতটা তার মাতামাতি ততোধিক তার নারীসমাজের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শৃঙ্খলের বন্ধন উপহারের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির উল্লেখ করা যায়। আর সামাজিক বাদবিচারে বাইরে তাঁরা যতই বক্তৃতায় উদার হননা কেন, বাস্তবক্ষেত্রে 'মনুই তাঁদের আমরণ গ্রাণকর্তা। প্রবাসী বাঙালী 'কম্‌লিকে ছাড়লেও কম্‌লি তাঁকে সহজে ছাড়েনা।' তাই সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতার পঙ্কভূত প্রবাসীর সমাজজীবনে অকস্মাৎ একদিন পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যাপারে দশপাটি দাঁত মেলে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। যেখানে মেলামেশায়, আহার-বিহারে, অবাধমিলনে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকেনা, সেখানে হঠাৎ একসময় পুত্রকন্যার পিতা-মাতা আচাঁৎবে আবিষ্কার করে বসেন যে, তাঁদেরও জনে-জনের কোন-না-কোন মহামুনির রক্তসম্ভূত কৌলীন্যে সমাজে ছোটবড় বংশগৌরবের অধিকার আছে! তখন সমপর্যায়ের ও সমকুল তথা সমমেলের ধাক্কায় পিতামাতাকে পুত্রকন্যার বিবাহের একটি যোগ্য গতির ব্যবস্থা করতে প্রায়ই বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। প্রবাসে কেহত আর কুল মেল খুঁজে-পেতে এসে ডেরা পেতে বসেননা। সুতরাং কুল বাঁচাবার জন্যে প্রবাসীর প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়।

এ ছাড়া সামাজিক সমস্যার অন্য একটা দিক আছে। কোন কোন প্রবাসী পরিবারে স্বাভাবিক নিয়মেই তথাকার মূল-বাসিন্দাদের আনাগোনা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কেবল যে উভয় সমাজের ভালমন্দ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে তাই নয়; ক্ষেত্রবিশেষে নতুন সংমিশ্রণের উদ্ভবও হয়। এমন অবস্থায় প্রবাসী সমাজে সমস্যার রূপান্তর ঘটে।

প্রবাসী বাঙালীর সাংস্কৃতিক সমস্যাই বড় সুকঠিন। বাঙালীর নিজস্ব একটি জাতীয় সংস্কৃতি গভীরতম প্রভাব নিয়ে বাঙালীর চরিত্রে বিদ্যমান। সেই কারণে জাতীয় চরিত্রের ভালমন্দ বাঙালী যেখানেই যায়, সেখানেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। অনেক অপবাদ আজকাল বাঙালীর প্রতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বাঙালী প্রবাসী হয়েও তাঁর সম্বল কালীবাড়ী, দুর্গাপূজো —এবং ঐ দুটিকেই কেন্দ্র করে ঘুটেমণ্ডলী পাকাতে ও কোন্দল করতে তাঁরা আসক্ত বলে শোনা যায়। উপরি 'সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' তাঁর অপবাদের সূত্র জোগায়। যেদেশে বাঙালী প্রবাসী সেখানকার সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা দূরে থাক,

প্রবাসী বাঙালীরা স্থানীয় জনসাধারণকে প্রায়শ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, এ অভিযোগও নতুন নয়। তা ছাড়া, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা প্রবাসীর মধ্যে ক'জনই-বা করে থাকেন।

উপরোক্ত দ্বিবিধ সাংস্কৃতিক সমস্যার সঙ্গে প্রবাসীর সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার সরস্যাও উল্লেখযোগ্য। সত্যি বটে, উত্তরভারতের কোন কোন নগরীতে প্রবাসী বাঙালী বালক-বালিকাদের মাতৃভাষা শিক্ষার যৎসামান্য ব্যবস্থা এতদিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐ যৎসামান্য ব্যবস্থা যেমন কয়েকটি জায়গায় মাত্র সীমাবদ্ধ তেমনি বহু জায়গাতে প্রবাসী শিশুদের বিদেশে কাটিয়ে একদা ছেড়ে আসা বাসভূমিতে আবার যে ফিরে গিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নেবেন, তেমন যোগ্যতাও তাঁদের মধ্যে সুলভ নয়। এবং অনেকেরই আদিম আবাস ইতিমধ্যে চির-অবলুপ্ত হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প এক-রকম উপহাস উৎপাদনেরই সহায়ক হয়।

যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে বাঙালী একদিন প্রবাসী হতে ইতস্ততঃ করেননি, ইতিহাসের রূঢ় পরিহাসে আজো তাঁর সে সমস্যা অনেকটা যেমন তেমনই রয়ে গেছে। বরং প্রবাসে যাঁরা কয়েক পুরুষ প্রবাসী তাঁদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজ আগেকার চেয়ে ভয়াবহ। কোন কোন প্রবাসী পরিবারের দুই তিন পুরুষের ভাগ্যবিবর্তন ও বিপর্যয় যেমন নাটকীয় তেমনি গবেষণার বিষয়। এমন পরিবারও প্রবাসে দুর্লভ নয়, যাঁদের প্রথম পুরুষে একমাত্র বিধাতাপুরুষের আদিম ও অকৃত্রিম উপহার সম্বল করে প্রবাসে এসে অর্থসম্পদে সৌভাগ্যশালী, সুখী পরিবার হিসাবে কিছুদিনের মধ্যেই নাম কিনে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী পুরুষে অতিমাত্রায় অত্যাধুনিক ও কৃত্রিম পরিবেশ ও ভোগবিলাসে আসক্ত হওয়ায় ভাগ্যের নির্মম রথচক্রতলে নিষ্পিষ্ট হয়ে বর্তমানে নিঃসম্বল ভিখিরীতে পরিণত হতে চলেছেন।

আদিতে প্রবাসী বাঙালীর অর্থনীতিক বনিয়াদ মূলত তৈরি হয়েছিল চাকরির ভিত্তিতে। দুই শতাব্দী আগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন ইংরেজরাজের ভারত শাসন কার্যের নানান্ শাখা-প্রশাখায় বাঙালী চাকুরিজীবীরূপে কেবল যে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাই নয়; ক্রমঅর্জিত সেই সুনামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তথা প্রবাসী বাঙালীর তথাকথিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠাই ক্রমাগত কঠোর প্রয়াস ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়না। শ্রেষ্ঠত্ব বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করাও মোটেই সহজ নয়। এই কথাগুলি আজিও যে অভ্রান্ত, বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালীর চাকুরি-আশ্রয়ী অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিপর্যয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অদূরদর্শিতা এবং অতিকঠোর-শ্রমভীতি তৎসহ জাতীয় চরিত্রগত ব্যবসা-বিমুখতার কারণে প্রবাসী বাঙালী এ পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতেই সন্তুষ্ট হয়ে এসেছেন। অধ্যাপনা, সেও চাকুরিহিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এরই ব্যতিক্রম ঘটেছিল ওকালতি এবং ডাক্তারিতে। তথাপি শেষোক্ত ক্ষেত্রদুটিতেও বর্তমানে প্রবাসী বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বীর একেই অভাব নেই, তদুপরি ক'জন প্রবাসী তরুণ-ই-বা আজকাল আর ওকালতি ডাক্তারির ক্ষেত্রে দশের একজন হবার কঠোর সাধনায় লিপ্ত আছেন!

মোটের উপর প্রবাসী বাঙালীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারেই ঘাতসহ নয়। যে কোন মুহূর্তে সামান্য আঘাতে সে বনিয়াদ ভঙ্গুর।

প্রবাসজীবনের এক পিঠ শেষ হল। কিন্তু অপর পিঠ না দেখলে এ-দেখা অসম্পূর্ণই

থেকে যায়।

বাঙালীর একটা দুর্নাম দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে, সে বড় ঘরকুণো জাত। ঘর আকড়ে বসে থাকতে পৃথিবীতে তার জুড়ি মিলে। কবিগুরু তাই দুঃখ করে বলেছিলেন,

"দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।"

তারপর অতীত হয়েছে অনেককাল। বঙ্গজননী স্বেচ্ছায় আজিও স্বীয় সন্তানদের গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া করতে একান্তই নারাজ। অথচ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের নরনারী ইতিমধ্যে দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে নানা প্রবাসে। মাড়োয়ারী, গুজরাটী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মালাবারী, তামিল, তেলেগু এমন কি মারাঠী প্রবাসীর সংখ্যা আজ নগণ্য নয়। তাই বলে বাঙালীকে সাধ করে মাড়োয়ারী বা মালাবারী হতে হবে, এ যুক্তির অবতারণার পক্ষপাতী আমরা নই। কিন্তু বাঙালীকে মানুষের মত বাঁচতে হলে বর্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের তরুণেরা বিশেষ করে মাড়োয়ারী, মালাবারীরা যেমন হাজারে হাজারে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ছে তেমনি তাঁদেরকেও ছড়িয়ে না পড়লে চলবে কি?

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, বাঙালী ত মাড়োয়ারী বা মালাবারী নয়। অর্থাৎ বাঙালীর জাতীয় চরিত্র মাড়োয়ারী বা মালাবারী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কে না জানে, জাতীয় চরিত্র সহসা কেন, দীর্ঘকালেও কদাচ কখনো অতি স্বল্পই পালটাতে দেখা যায়। কাজেই বাঙালীকে মাড়োয়ারী বা মালাবারী চরিত্র আশ্রয় করতে বলা অসম্ভবকেই সম্ভব করতে বলার সমান। যদিও ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে আসল অধিকারী এবং অনুকরণকারীর মধ্যে প্রতিযোগিতা যথার্থই অসম। সুতরাং বাঙালীকে প্রবাসে দাঁড়াতে হলে দাঁড়াতে হবে নিজেরই পায়ে ভর দিয়ে।

অতীতের ধারা বেয়ে যেসকল বাঙালী এপর্যন্ত প্রবাসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে স্বীয় উৎকর্ষ প্রমাণ করে জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। কিছুকাল থেকে প্রবাসে প্রবাসী বাঙালীর প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরবার কারণ ইদানীং তাঁদের পরাশ্রয়ী মনোভাব ও তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে উৎকর্ষের আকাল-আবির্ভাব। তদুপরি মূল বাঙালীর জাতীয় জীবনে বর্তমানে যে হতাশার-বান ডেকেছে তারও আঘাত প্রবাসী-জীবনের বেলাভূমিতে আঘাত হানছে।

তথাপি প্রবাসী বাঙালীকে প্রবাসী হিসেবে বাঁচতে হবে। বাঙলার ছিন্নমূল নরনারীর উল্লেখযোগ্য একটা প্রবাহের প্রবাসেই ঘর গড়বার জন্য উদ্যোগী হওয়া আজ প্রয়োজন। কারণ জন্মভূমির বৃহত্তর ভূখণ্ড হারিয়ে এখন কেবল ক্ষুদ্রতম অংশ জুড়ে আশ্রয়ের জন্যে কামড়া-কামড়িতেই বাঙালী তথা ছিন্নমূল বাঙালীর বৃহত্তর কোনো সমস্যারই সমাধান হবেনা। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীরই যেখানে টিঁকে থাকা দায় হয়ে ওঠার অবস্থা, সেখানে ছিন্নমূল কিংবা তরুণ বাঙালীদের প্রবাসে ছড়িয়ে পড়তে বলায় অনেকেই মুচ্‌কে হাসবেন বইত নয়। যেই যত হাসুকনা কেন, হাসি-মশ্‌করা উপেক্ষা করে, ভাবপ্রবণতার আড়ম্বর ছেড়ে, স্বার্থীদের প্ররোচনায় না ভুলে বাঙালীকে ভবিষ্যৎ ভেবে ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে প্রবাসে নতুন ঘর গড়বার জন্য বাস্তব রূঢ়তার মুকাবেলায় না নামলে আর চলবেনা।

কথায় কথায় আমরা কিছুটা প্রসঙ্গান্তরে এসে যদি পড়েই থাকি, মূল সমস্যার কারণেই তেমনটা ঘটেছে। আসল প্রসঙ্গে এবারে ফিরে গেলে মন্দ হয়না কি!

প্রবাসী বাঙালীর ইতিহাসে এ স্বীকৃতির অভাব নেই যে, বাঙালীর প্রতিভা ভারতের প্রতি প্রান্তের নমস্য। সেই প্রতিভার মন্বন্তর আরম্ভেই তাঁর দুর্গতির শুরু। এখন তাই প্রবাসী বাঙালীর প্রতিষ্ঠাকে স্থায়িত্ব দেবার একমাত্র পথ, নতুন প্রতিভার আত্মপ্রকাশ। বাঙালীর

মধ্যে প্রতিভার চির-অপমৃত্যু ঘটেছে,—এমন অসত্যভাষণে তাঁর অতিবড় শত্রুরও আস্থা হবার কথা নয়। আসলে সমস্যা হচ্ছে, বিপথগামী এবং সাময়িক বিভ্রান্তিতে হতাশ ও বিহ্বল প্রবাসীদের সচেতন করবার সমস্যা। বাঘের সন্তান সে বাঘই! কিছুকালের জন্য আপন সত্তা হারিয়ে বস্‌লেও বারেক চেতনার কশাঘাতে তাঁকে স্বীয় সত্তায় পুনর্জীবিত করে তুলতে পারলেই দেখা যাবে, বাঘ জেগে উঠেছে।

এর পরই প্রয়োজন, প্রবাসীর নতুন সমাজজীবন সম্পর্কে নতুনতর আসক্তির। যে সমাজ থেকে প্রবাসী বাঙালী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিংবা অদূরভবিষ্যতে পড়বে; সে-সমাজের মূলগত সত্যটুকু আকড়ে-ধরে আর যত মায়া-মোহ, বন্ধন-শৃঙ্খল অসঙ্কোচে তাঁকে অতি দুঃখে হলেও যেমন ছাড়তে হবে, তেমনি নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রবাসী বাঙালীকে তাঁর নিজস্ব সমাজের ভিত্তিস্থাপনে তৎপর না হলে চলবে কেমন করে?

তাছাড়া যেদেশে প্রবাসী, সেদেশের সঙ্গে হৃদ্যতার আদানপ্রদান না বাড়লেই প্রবাসীর জীবন স্বচ্ছন্দগতিতে চল্‌বার সম্ভাবনা কোথায়! অপরের মধ্যেকার শ্রেয়কে আপন করে নেবার প্রয়াসেই জীবনের জয় সূচিত হয়। প্রবাসী বাঙালী দেওয়া ও নেওয়ার নীতিতে অগ্রণী হয়ে,—'তারাই সেরা, তারাই সব' এ ভ্রমাত্মক কম্‌প্লেক্‌স্‌ ত্যাগ করে প্রবাসে স্থানীয় জনসাধারণের বন্ধুত্ব অর্জনে তৎপর হলে বহু অপ্রিয় সমস্যার আস্তে আস্তে শুভ সমাধান অনেকটা সম্ভবপর।

অমল ঘোষ

একান্নবর্তী পরিবার

বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ের কথা হচ্ছিল। কন্যাপক্ষরা যাতায়াত আরম্ভ করে দিয়েছে। চিঠিতে অনুরোধ আসছে : আপনারা অনুগ্রহ করে এসে মেয়ে দেখে যান। মেয়েটি গৌরবর্ণা, সুশ্রী সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা ইত্যাদি।

গৃহকর্তা একদিন শুভলগ্নে গেলেন মেয়ে দেখতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলেন, বাড়ীর মেয়েদের তাগিদে। বিবাহের ব্যাপারে পণ্য খরিদের মত মেয়ের রূপ খুঁটিয়ে দেখার ঘোরতর বিরোধী তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাবী কুলবধূ নির্বাচন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করা উচিৎ বংশ-পরিচয়ে। যাই হোক, মেয়ে আসনে এসে বসলে পর কর্তা মধুর মাতৃসম্বোধনে মাত্র দুটি প্রশ্ন করলেন তাকে। একটি, মায়ের নাম। আর একটি : একান্নবর্তী পরিবার মানে কি মা?

মেয়েটি 'একান্নবর্তী পরিবার' কথাটার মানে বলতে পারেনি। ফলে, কর্তা তাঁকে মনোনয়ন করেননি।

উপরোক্ত ঘটনাটি কল্পিত নয়, সত্য। লেখক স্বয়ং সেদিন সেই রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটিকে দর্শনমাত্র সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন, মেয়েটিকে পুরা পাশ মার্ক দিয়ে "বৌদি" রূপে বরণ করে বসেছিলেন। কিন্তু কন্যাপক্ষের বাড়ী থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামহাশয় লেখককে হতাশ করে রায় দিয়েছিলেন, নাঃ, এখানে পছন্দ হল না।

অপছন্দের প্রধান কারণ, মেয়েটি 'একান্নবর্তী পরিবার' কথাটার মানে বলতে পারেনি। না, না, আমাদের এই বড় সংসারটাকে এক হাঁড়িতে বেঁধে রাখতে পারবে না; একলা ঘরের মেয়ে,

এখনও পর্যন্ত ঐ একান্নবর্তী পরিবার শব্দটাও শোনেনি সে; ওখানে আমি বিয়ে দোবো না ছেলের, তা সে যত রূপবতীই হোক্ না কেন ও-মেয়ে!—জোরে জোরে মাথা নেড়ে কথাগুলো বলেছিলেন জ্যাঠামশাই।

হয়তো সেদিনের সেই কুমারীকন্যা অন্য কোনো একান্নবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সেই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে চলেছেন আজও—কিন্তু তবু তাঁর দোষ দেখিনা আমি। তিনি রূপ চাননি, রূপাও নয়, চেয়েছিলেন বংশের একটি আদর্শকে জিইয়ে রাখার মত শিক্ষা-দীক্ষা-সম্পন্না একটি মেয়ের সন্ধান।

এই একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ বাংলাদেশের ঘর থেকে একেবারে নির্বাসিতপ্রায়। এ এক দুর্লক্ষণ। কিন্তু, কেন এমন হচ্ছে? এ-আদর্শকে ফিরিয়ে আনার ও জিইয়ে রাখার কি কোনো উপায় নেই?

মেয়েদের 'ঘর ভাঙানে' অপবাদ আছে। একথা সত্যি যে, মেয়েরা উদার, সহৃদয়া ও সহ্যশীলা না হলে একান্নবর্তী পরিবারে ফাটল ধরতে দেরী হয়না। কিন্তু সব দোষটা তার একার নিশ্চয় নয়। পুরুষকেও সেই সঙ্গে উদার ও স্বার্থত্যাগী হতে হবে। কিছুটা কঠোরও। অর্থাৎ স্ত্রীকে সৎপরামর্শ দিয়ে স্বীয় আদর্শে দীক্ষিত করতে না পারলে একটু কঠোর হয়েও তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে : তুমি ভুল করছো সহধর্মিণী!

এক পরিবারের বড় ভাই সবচেয়ে বেশী উপার্জন করতেন। এত বেশী যে তাঁর নিজের স্ত্রী ও দুটি পুত্রের পক্ষে তা অঢেল। কিন্তু, আর তিনভাইয়ের ছিলো একেবারে ছা-পোষা কেরাণীর আয়, অথচ বড় সংসার। চারভাই চার-বৌ এক হাঁড়ি নিয়ে থাকতো সুখে। বড় বৌয়ের কিন্তু বুকের ভেতর কেবল খচ্‌খচ্ করতো। আমার সোয়ামি, আমার ছেলে এদের জন্য ভালো খেতে-পরতে পায়না এই তাঁর ক্ষোভ। পুজোর সময় বড় ভাই একই প্রকারের ধুতি আনলেন চারটি। চার ভাই পরবেন। বড়বৌ আড়ালে বললেন, হ্যাঁগো! তুমি নিজের জন্য একটা ফাইন ধুতি আনলেই পারতে! এ-ধরণের প্রস্তাব বড়বৌয়ের এটা প্রথম নয়। প্রায়ই তিনি বলেন। স্বামী বারবার বিরক্তি প্রকাশ করা সত্ত্বেও। এইবার কর্তা তাঁকে উচিৎ শিক্ষা দিলেন রাত্রে আহারে বসে। চার ভাই একসঙ্গে বসে খাচ্ছেন, বড়বৌ পরিবেশন করছেন, সেই-সময়। জানিস্, তোদের বড়বৌদি বলছিলো. . . ! কথাগুলো সপাং সপাং করে চাবুক কষালো বড়বৌয়ের পিঠে। সেই তাঁর শেষ সংকীর্ণ প্রস্তাব। এরকম কঠোরতা পুরুষের থাকা দরকার। অন্ততঃ বড়বৌ এ-কঠোরতার ফলে 'ঘর ভাঙানে' অপবাদের হাত থেকে রেহাই পায়।

এমন সংসারও আছে যেখানে উল্টোটা দেখা যায়। অর্থাৎ স্ত্রী চায় মিলে-মিশে সমদুঃখী সমসুখী হয়ে এক সংসারে থাকতে। নিজের ছেলেকে জুতো কিনে দেয়না, যদি জায়ের ছেলের পায়ে জুতো না থাকে। স্বামীকে ধিক্‌কার দিয়ে শেখায় একান্নবর্তীতা। মোট কথা, স্বামী ও স্ত্রী দুজনার মধ্যে এ-বিষয়ে সহযোগিতা ও সম-আদর্শ-প্রবণতা না থাকলে একান্নবর্তী সংসার টিকে থাকা মুস্কিল।

এ-যুগে এ-ধরণের সংসার ভেঙে-চুরে যাচ্ছে। এজন্য দায়ী কিন্তু শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রীরা নন। না চাইলেও আজকাল ভাইয়ে-ভাইয়ে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় পরস্পরের কাছ থেকে। রোজগারের তাগিদে। বড়ভাই হয়তো চাকরী পায় কলকাতায়, মেজ ভাই লক্ষ্ণৌয়ে, সেজো কাণপুরে, আর ছোট থেকে যায় গ্রামে। চারজন চারদিকে ছড়িয়ে থাকার ফলে তেমন টান

থাকেনা পরস্পরের প্রতি। প্রত্যেকে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, আসে সংকীর্ণতা। সেই সংকীর্ণতাকে আবার প্রশ্রয় দেয় অর্থনৈতিক কারণ কয়েকটা। যে-ভাই কলকাতায় বসে পাঁচশো-টাকা রোজগার করছেন আজকাল, পাঁচটা ছেলে-মেয়ের সংসার হলে তাঁর পক্ষে বড় কষ্টসাধ্য হয় সেই আয় থেকে কিছু বাঁচিয়ে গ্রামের অভাবী ভাইকে নগদ টাকা পাঠানো। আগেকার কালের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অন্যরকম। আবাদী জমিই ছিল সংসারের গ্রন্থি। জমি থেকে সম্বৎসরের খাদ্য আসতো এবং সেই জমির অনুগ্রহেই অতি বড় একলষেঁড়েও থাকতো একান্নবর্তী সংসারের একজন হয়ে। কিন্তু সে-যুগ আর আসবে কি? না। অসম্ভব তা ফিরে আসা। এই কল-কব্জার যুগকে মানুষ এনেছে; ফিরে-যাবার উপায় নেই, ফিরে-যাবার চেষ্টাও অর্থহীন। পেটের দায়ে চার ভাই চার দিকে ছিটকে পড়বেই। কিন্তু তবু সে ইচ্ছে করলে পেটের কাছে মনটাকে গোলাম করে না-রাখলেও পারে। অর্থাৎ একান্নবর্তী সংসারের যে-মূল কথা, সেই প্রেম-প্রীতিকে নিশ্চয় সে জাগ্রত রাখতে পারে। বছরে একবারও যদি চারটে পরিবার এক হয়ে আর্থিক অসাম্য ভুলে থাকতে পারে কিছুদিন, তা হবে মন্দের ভালো।

সেটাও কি এ-যুগে অসম্ভব?

সরিৎশেখর মজুমদার

স মা জ স ম স্যা

গুরুজন-সমস্যা

অন্যান্য সমস্যার মত গুরুজনেরাও যে বাংলাদেশের একটি সমস্যা একথা অপাতবিচারে হাস্যকর মনে হলেও তা একান্ত সত্য।

এই সমস্যা গুরুজনেরা সৃষ্টি করেন নি, সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে আমাদের সামাজিক রেওয়াজের জন্য। বাপ-দাদা-জেঠী-খুড়া ইত্যাদি গুরুজনের সঙ্গে কনিষ্ঠদের সম্পর্ক গুরুতর যতটা না প্রীতির তার শতগুণে ভয়-সম্ভ্রমের। পাশ্চাত্য দেশগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, ভারত-বর্ষেও অন্য কোথাও সম্ভবত ভয়-সম্ভ্রম আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ককে এভাবে ছাপিয়ে ওঠে নি। গুরুজনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ত কল্পনাতীত, সম্ভ্রম বজায় রাখার জের টানতে টানতে তাঁদের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কথাবার্তার রেওয়াজই উঠে গেছে। সাধারণত পরিবারের পুরুষদের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য, কিন্তু আজকাল মহিলাদের ক্ষেত্রেও সম্পর্ক কাঠিন্যের এই ছোঁয়াচ লেগেছে।

ফলে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়েছে? বাল্য অতিক্রান্ত হতে না হতে আমাদের ছেলেরা বহির্মুখী হয়ে পড়ে (মেয়েরা যদি না হয়, তার কারণ, বিভিন্ন সামাজিক কারণে তাদের নিরুপায়তা; কিন্তু আজকাল মেয়েরাও অনেকটা বহির্মুখী হয়ে পড়েছে)। পারিবারিক বন্ধুত্বের, হৃদ্যতার রস থেকে বঞ্চিত হয়ে বাইরে তারা এ রসের সন্ধান করে। বাবা, দাদা প্রভৃতি গুরুজনদের সঙ্গেও যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এ ধারণা বাংলাদেশে আজ কল্পনাতীত। পরিবারের বাইরে সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বাভাবিকতা বা প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু পারিবারিক বন্ধুত্বের দিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার ফলে আত্মীয়-সম্পর্কের ভারসাম্য আমরা হারিয়ে ফেলেছি, এবং তা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই মঙ্গলজনক হয় নি।

পারিবারিক সখ্যতার অভাবে পারিবারিক আকর্ষণও শিথিল হয়ে পড়েছে। (এই শিথিলতার মূলে অবশ্য বর্তমান সামাজিক রূপান্তরও অনেকটা দায়ী।) আমাদের ছেলেরা কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বয়স্কদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ সেই ব্যবধান যেন বেড়েই চলে। তারপর থেকে তাদের অন্তরঙ্গতা সম্পূর্ণভাবে সমবয়সী বন্ধুদের (ইয়ার বলাই সঙ্গত) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বয়স্কদের সাহচার্য এই বয়সে কিশোরদের যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক। যথার্থ পরিচালনা শুধু শাসন বা সাময়িক উপদেশে অসম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের। কিন্তু বাংলাদেশে তা ঘটে কি? ঘটে না বলেই আমাদের দেশের কিশোরেরা তথা যুবকেরা বিপথগামী হয়ে পড়ে, চারিত্রিক পঙ্গুতায় সমাজকে আরও অসুস্থ করে তোলে।

একটা উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের লভ্য না হলেও আমরা সকলেই জানি যে বাঙালী ছেলেমেয়েদের মধ্যে শরীর ও মনের বিশেষ ক্ষতিকারক কয়েকটি কু-অভ্যাস অত্যন্ত ব্যাপক (অস্বাভাবিক যৌন-অভ্যাস সবদেশেই আছে, কিন্তু সঙ্গত

কারণেই আমাদের অনুমান, এই অভ্যাস বাংলাদেশের মত অন্যত্র কোথাও এত ব্যাপক নয়।) আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌনতা বা যৌনচর্চা প্রায় সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে। এর একটা প্রধান কারণ, মানুষের আমোদের একটি বিশেষ দিক, পারিবারিক আমোদ, আমাদের বাঙালী সমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশে আগে পারিবারিক আমোদের ঘাটতি ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ—এর মধ্যে, নানা ব্রত-উৎসব আর পারিবারিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে এই আমোদ, এই সাহচর্য আগে সহজলভ্য ছিল। সামাজিক রূপান্তরের মুখে স্বভাবতই সেই সব পুরনো আচার-প্রথা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার পরিবর্তে পারিবারিক সাহচর্যের তথা আমোদের নূতন কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না, এমনকি সেদিকে সচেতনতাও নেই। আধুনিক জীবনযাত্রাতেও এই সাহচর্য সম্ভব। ইংরেজেরা সপরিবারে বেড়াতে যায়; লম্বা ছুটীতে দূরে স্বাস্থ্যকর জায়গায়, ছোটখাট ছুটীতে এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কাছে পিঠে কোথাও পিকনিকে, বা এমনি ঘুরে আসে। ওদের পরিবারে বাবা-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধ শুধু শাসন বা সম্ভ্রমের নয়, সখ্যতারও বটে। বয়স্করা কনিষ্ঠদের সঙ্গে নানা খেলাধূলায় যোগ দেয়, যা আমরা ভাবতেই পারি না। পারিবারিক রঙ্গ-রসিকতাও বাঙালী পরিবার থেকে ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে (বৌদি বা বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে আত্মীয়দের মধ্যে রস-রসিকতায় যৌনতার ছোঁয়াচ আছে বলেই তার রেওয়াজ এখনও আছে। দাদু-দিদিমার রঙ্গ-রসিকতা কি অধিকাংশ পরিবারে প্রথামাত্র হয়ে পড়ছে না?) আজকাল আমাদের কাছে রসিকতা মানেই 'ইয়ারকি'। এটা হল কেন? হ'ল এই কারণেই যে আমরা মিশি শুধুমাত্র সমবয়সীদের সঙ্গেই। কৈশোরের মেলামেশা যদি শুধুমাত্র সমবয়সীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে স্বভাবতই তাদের চিন্তা এবং কৌতূহল বিশেষভাবে যৌন চর্চাতেই ব্যায়িত হবে। রসরসিকতাতেও যৌনতাই প্রাধান্য পায়। আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক কু-অভ্যাসের মূলে তাদের মনকে নানামুখী করে তোলার জন্য সামাজিক ব্যবস্থার অভাব কতখানি দায়ী তা ভেবে দেখতে হবে।

আমাদের রসিকতা মানে ইয়ারকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইয়ারকির মধ্যে সম্ভ্রমের স্থান নেই। সম্ভ্রম বজায় না রাখতে পারলে বয়স্কদের সঙ্গে মেশাও অসম্ভব আর সম্ভ্রমের চেয়ে বড় কোন কথা হতে পারে না! ধরুণ, সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, বয়স হলে যে ছেলেরা সিগারেট খাবে একথা মেনে নেওয়া হয়েছে। অথচ আমাদের পরিবারে বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়া মানে পৃথিবী রসাতলে যাওয়া! কারণ, এটাকে অসম্ভ্রমের চিহ্ন বলে ধরা হয়। আর সব সহ্য হবে, সম্ভ্রমের ঘাটতি হলে চলবে না! আমাদের এই সম্ভ্রমকাতরতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। হয়ত তা আমাদের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিণতি; হয়ত বা বর্তমান সামাজিক বিপর্যয়ের বিশৃঙ্খলায় মানুষের আত্মবিকাশ বা সামাজিক স্বীকৃতিলাভের পথে যে সংকট দেখা দিয়েছে তারই প্রতিক্রিয়ায় পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আমাদের এই সম্ভ্রম-কাতরতা প্রকট হয়ে উঠেছে। বয়স-গোষ্ঠি (age-group) নিয়েও তাত্ত্বিক আলোচনা চলতে পারে। তবে আপাতত আমরা সমস্যাটিকে সাদাচোখেই খতিয়ে দেখছি।

প্রথমতঃ গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাই প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। যে আলাপে সরসতার অভাব ঘটে তাকে সকলে এড়িয়েই চলে এবং এইভাবে সম্পর্কে এমন একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয় যে তা ক্রমশঃ অলঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। শুনতে অস্বাভাবিক হলেও, বলা চলে যে বাংলাদেশে পিতাপুত্রের মধ্যে যে সম্ভ্রমাত্মক ব্যাবধান প্রচলিত তা সম্ভবতঃ অন্য যে-কোন আত্মীয়তাসম্পর্কের চেয়ে বেশী দূরের হয়ে

দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারের সকলের সঙ্গে সহজ মেলামেশার অভাবে আমাদের সাহচর্য বহির্মুখী এবং বয়স-গোষ্ঠির অলিখিত রীতি অনুযায়ী বাইরেও আমাদের বন্ধুত্ব একান্ত-সমবয়সীদের সংকীর্ণ গোষ্ঠির মধ্যেই আবদ্ধ। ফলে, আমাদের চারিত্রিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে না। তৃতীয়ত, এই সীমাবদ্ধতার ফলেই রসিকতা এবং রসবোধও যৌনতার মধ্যেই ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। (অথচ বাঙালীরা বেরসিক জাতি এ অপবাদ দেওয়া অসম্ভব ছিল) রসের ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও নেবে গেছে স্বভাবতই। চতুর্থত, আমাদের বহির্মুখিতার ফলে আমাদের এখন 'ঘর' বলতে আর কিছু নেই। আমাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে। তরুণদের কাছে, ঘর হোটেলের বেশী কিছু নয়— আহার এবং নিদ্রার স্থান মাত্র। সর্বশেষে, পারিবারিক এবং মানসিক এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংস্কৃতিও ব্যাহত হচ্ছে। কারণ আমাদের চরিত্রগঠনের অসম্পূর্ণতার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃষ্টিক্ষমতা বা সৃজনীপ্রতিভার যথার্থ বিকাশ অসম্ভব। বাঙালীর জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সৃজনশীলতার যে অভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার মূলে আমাদের পারিবারিক জীবনে বয়স্ক-কনিষ্ঠের এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক যে অনেকাংশে দায়ী নয় তা কি জোর করে বলা চলে?

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

স মা লো চ না

হিমাদ্রি ঃ— রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। সাড়ে তিন টাকা।

"শুনেছি আর দু-চার বছরের মধ্যেই বদরীনাথ পর্যন্ত বাস-রাস্তা হয়ে যাবে। এত যে মাধুর্য এই পথের, এ আর তখন থাকবে না। মোটর হাঁকিয়ে আসবে সবাই, ঝনঝন টাকা ঢালবে, টাট্‌কা টাট্‌কা পুজো দিয়ে নগদানগদ ফলাফল নিয়ে বাড়ি ফিরবে।" কেদার-বদরী দর্শন শেষ করে এই কথা লিখেছেন শ্রীরাণী চন্দ তাঁর "হিমাদ্রি" ভ্রমণকাহিনীতে। পড়তে পড়তে মনে হ'ল সত্যিই, আর দুদিন বাদে আধুনিক সভ্যতা এসে গ্রাস করবে ভারতের এই তীর্থভূমিকে। হিমালয়ের গা ঘেঁষে চলে গেছে যে সর্পিল, বন্ধুর পথ তার চার পাশে ছড়ানো আছে ভারত-আত্মার কত বাণী, লুকিয়ে আছে ইতিহাসের অজস্র উপকরণ। ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে জানবার ও চেনবার, তার অতীত পরিচয়ের যে সব সাক্ষ্য আজও এইসব সুদূর তীর্থের পথে পথে অবশিষ্ট আছে, দুদিন পরে তা যদি আর না থাকে, তাহ'লে আমাদের ঐতিহ্যের একটা বিশেষ দিকই যাবে লুপ্ত হয়ে। তবুও সান্ত্বনা যে এই সব তীর্থভূমির স্মৃতি ধরা থাকছে, তার পথ আর পাথরের, মানুষ আর মন্দিরের ছবি আঁকা রয়েছে 'হিমাদ্রি'র মত তীর্থভ্রমণ কাহিনীর পাতায় পাতায়।

গত কয়েক যুগে, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। ভ্রমণকাহিনীর দিকটা কিন্তু সমান তালে পা ফেলে চলতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় জলধর সেনের "হিমালয়" একদিন কেদার-বদরীর পথে আমাদের নতুন করে হাতছানি দিয়েছিল। তারপর কত শত তীর্থযাত্রী হৃষিকেশের পথ বেয়ে চলেছে কঠিন-কেদার আর বিশাল-বদরী দর্শন-মানসে। অভিযানকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ কাহিনীও অনেক লেখা হয়েছে। কোথাও রোমান্সের ছোঁয়া লাগিয়ে কাহিনীকে রঙীন করা হয়েছে, কোথাও আছে বিজ্ঞানীর সন্ধানীদৃষ্টিতে রহস্য ভেদের প্রাণপন প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে ভ্রমণকাহিনীতে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবারও অভাব নেই। কিন্তু "ধনী দরিদ্র সবাই আসে বিপৎসংকুল এই একটি পথে; কী-না, দেবদর্শন করবে" নিছক সেই তীর্থ-পথের কথা, তীর্থকামী ধনী দরিদ্রের ভক্তি আর বিশ্বাসের ওপর ভর ক'রে পথ চলার কথা, দেবদর্শনের আকুল আকাঙ্খার কথা নিয়ে পথ চলার কাহিনী হ'ল "হিমাদ্রি"। যাঁরা শুধু ভ্রমণ ভালবাসেন তাঁদের যেমন এই বই ভাল লাগবে, তেমনি ভাল লাগবে তাঁদের যাঁরা বিশ্বাস করেন "তীর্থভ্রমণ সংসারী লোকের পক্ষে আর কিছুই নয়—চালুনী দিয়ে ছেঁকে মাঝে মাঝে নিজেকে পরিস্কার করা।"

লেখিকা সমালোচনার জটিলতা, সূক্ষ্ম ও সন্ধানী দৃষ্টির আঁকাবাঁকা পথ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন বলেই তাঁর লেখায় ভ্রমণকাহিনীর স্বাদও যেমন পাওয়া যায় তেমনি জায়গায় জায়গায় জমে ওঠে কাব্যের মাধুর্য আর গল্পের রস। এরসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহেরও অভাব নেই, যেমন কেদার-বদরী ভ্রমণের "সুবিধে-অসুবিধের জরুরী কথা", "চাঁটর নাম, পথের হিসাব" আর টুপি, লাঠি ইত্যাদি কি কি জিনিষ কাজে লাগে তার বিবরণ। "এ যেন এক অখণ্ড জ্যোতি, দিবারাত্রি জ্বলছে বদরীনাথের শিয়রে। নানা রঙের আলোর ছটা ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে নিশিদিন তার এই আরতির নিবেদন, চোখের সামনে যেন আর কার রূপের আভাস ইঙ্গিতে ধরিয়ে দিয়ে যায়।"—এই জ্যোতির ছটা ছড়িয়ে আছে লেখার ছত্রে ছত্রে, এই অরূপের আভাস আছে নগাধিরাজ হিমালয়ের রূপ বর্ণনায়। এক কথায় সমস্ত কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি চিত্রধর্মী, সংবেদনশীল, ভক্তিরসাপ্লুত মনের পরিচয়। এরই মধ্যে 'চম্পাকে' এনে একটু রহস্যের চমক না লাগলেই যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত। কাহিনীর শেষে এসে এই রহস্যের চমকে কেমন যেন সুর কেটে যায়।

গ্রন্থের ভাষা বিষয়বস্তুর বর্ণনায় আর পরিবেশ সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। "পূর্ণকুম্ভে"র পর "হিমাদ্রি" নিঃসন্দেহে সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি।

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ মেঘ ঃ—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। দু'টাকা।

আধুনিক কবিতার নামে অনেক শিক্ষিত পাঠকও আঁতকে ওঠেন। এর জন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুত, অনেক আধুনিক কবির এমন সব কবিতা আছে যা শুধুমাত্র কথার কারিগরী বা তত্ত্বের কচকচানি। এগুলিকে কবিতা না বলে দুর্বোধ্য বাকোর সমষ্টি বলাই ভাল।

আশার কথা "নিঃসঙ্গ মেঘে"র কবি সে পথে পা বাড়াননি। তাঁর প্রতিটি কবিতার ভাষা সুন্দর ও সহজ, কিন্তু ভাবটি চিরন্তন কবি-মনের। উপরন্তু তাঁর কবিতা চিত্র-বহুল। প্রতিটি কবিতা থেকেই একটি দুটি চোখের ওপর ফুটে ওঠে। কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে এবং তার মাধুর্য মনকে বহুক্ষণ ছেয়ে রাখে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিঃ

"স্বপ্নের সোনার শয্যে—
ভরে ওঠে মনের প্রান্তর;
পাকা ধান ভাবে; কবে—
কার দুটি হাতের ছোয়ায়
স্থান পাবে স্মৃতির ভাণ্ডারে।
পড়ন্ত রাতের আলো—
ঠিক যেন শেষের কবিতা—
সুরের প্রত্যাশা সুরে—
ঠিক যেন সমাপ্তির গান!
এইখানে শেষ তাই—
প্রতীক্ষার তপস্যা তোমার। (প্রতীক্ষার রাত)

মালবিকা সরকার

॥ দেশবিদেশের খবরের জন্যে ॥

উইক্‌লী ওয়েষ্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬·০০ টাকা; ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা।

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩·০০ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২·০০ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত হিন্দি-বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক ০·৭৫ টাকা।

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩·০০ টাকা ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগরেবী বংগাল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩·০০ টাকা; ষান্মাসিক ১·০০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক নিচের ঠিকানায় লিখুন :
প্রচার অধিকর্তা,
রাইটার্স বিল্ডিংস্,
কলিকাতা ১